সুধীর চক্রবর্তী

১৯৩৪–২০২০

পৃথিবীর আমার প্রেম বাউলের উদ্দীপ্ত মস্তকে
গন্ধে গন্ধে গানে গানে রক্তরাগ প্রস্ফুট কহ্লারে
বর্ষার বনজ স্বপ্নে মেঘশ্লোক উদাস মল্লারে
প্রমত্ত যৌবন বন্যা দিগ্বধূর লম্বিত অলকে

রক্তে রক্তে পরিব্যাপ্ত মত্ততার নিশ্চিত নখর
নিষ্ফল স্বপ্নের গন্ধে ঈশ্বরের আদিম সমরে
যখন সমস্ত বোধি অন্ধকারে মাথা কুটে মরে
বঞ্চনার মুক্তধার মেলে ধরে বিতংস প্রখর

চেতনার অন্তঃস্থলে অগ্রসর হরিণের যেন
অবিবেকে ছুটে চলি : মৃগলুব্ধ : সাথে চলে প্রেম ॥

॥ মৃগলুব্ধ ॥

সুধীর চক্রবর্তী

দুই চোখে তুমি জয়ের প্রদীপ জ্বালো
শুনেছি তোমার রূপেই তোমার ঋদ্ধি
তবু দহনের বিশ্বজয়ী আগুন
জ্বালায় আমাকে, ক্ষয়ের চক্রবৃদ্ধি ।

জানি যে তোমার কাঁটাভরা তুমি
যৌবনও হবে জরাঘাতে নিবৃত্ত
তবুও আসে আমার তীব্র কামনা
কামনা আমার নিত্যপ্রত্যাবৃত্ত ।

বিশ্বসৃষ্টি-নৈরাজ্যের পণ্য :
ঈশ্বর নেই, একথা বলেছে সাংখ্য
তবু পুষ্পের সায়কবিদ্ধ চেতনা
নটিনী নিয়েছে আলোড়িত মানসাঙ্ক ।

॥ স্বয়ম্বর ॥

সুধীর চক্রবর্তী

২০

অমৃত-যন্ত্রণা-য় প্রকাশিত সুধীর চক্রবর্তীর কবিতা

মায়ার মমতা দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলি
স্বয়ম্বরের সর্বনাশিনী শংকর
তবু মনে জাগে প্রেমের পরমতম
সহজিয়া যেন আদিম শুভংকর ।

এই দেহ শক্তি-জয়ী হবে নির্বাণে
ত্যাগের পুণ্য ধূম যেন আঁখি পাতে !
তুল মহাকুল তোমার অন্তরে আসেই
দেহমন মৃত রক্ত সঞ্চারণাতে ॥

॥ একটি প্রেমের পুরাণে ॥
সুধীর চক্রবর্তী

এ কথা অসত্য নয় : মাঝে মাঝে দৃষ্টিক্লান্ত দিনে
ইন্দ্রনীল রঙ লাগে অনিরুদ্ধ মেঘের সীমায়
আনন্দের ছন্দ জাগে নিত্যকৃত্য ম্লান দৈনন্দিনে
(সেই দিনে [illegible] সুর ভেসে যায় দূরে)

স্বপ্নস্বচ্ছ দুটি চোখ প্রত্যাশের প্রদীপ্ত প্রপাতে ;
আশংকার সংক্রামিত পরিহীন দেহের বলয়ে
জাগার চেতনা ভরে, হায় নিদ নাহি আঁখি পাতে
(একটি বিস্ময়স্নিগ্ধ সঙ্গী-লিপ্সু সন্ধ্যা মৌনতুরে)

শুচিব্রতা কোনো মেয়ে শুভশ্রী সন্তাপে শান্তমতি
কেটেছে কৈশোর তার ময়ূরাক্ষী নদীর কল্লোলে
কৃত্রিম শহরে এসে তবুও সে অসময় শ্রীমতী
(কানে কানে ময়ূরাক্ষী ঢেউ ভাঙে আজো কত সুরে)

প্রেম কাকে বলে? জানি যৌবনের অলক্ত উর্মিলা
স্বর্ণ-ধূ । দুটি মত্ত চোখের তুলিরে অনন্ত
কল্পনার গান : দেহে অনুলিপ্ত ক্লান্তির [illegible]
(দেহবন্দী প্রেম কাঁদে ইমনীর দীপ্ত অশ্রুপুরে)

২১

অমৃত-যন্ত্রণা-য় প্রকাশিত সুধীর চক্রবর্তীর কবিতা

আলোকচিত্রী: সোমনাথ ঘোষ

গভীর নির্জনে

সুধীর চক্রবর্তী

১৯৩৪–২০২০

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে ‘হরপ্পা’-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশিত হল ‘হরপ্পা’-র শ্রদ্ধার্ঘ্য

গভীর নির্জনে

প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশনা

সোমনাথ ঘোষ

কৃতজ্ঞতা

নিবেদিতা চক্রবর্তী

শ্রেয়া গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক

সৈকত মুখার্জি

http://harappa.co.in/

harappamagazine@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

সুধীর চক্রবর্তীর গুণমুগ্ধ পাঠকদের উদ্দেশে

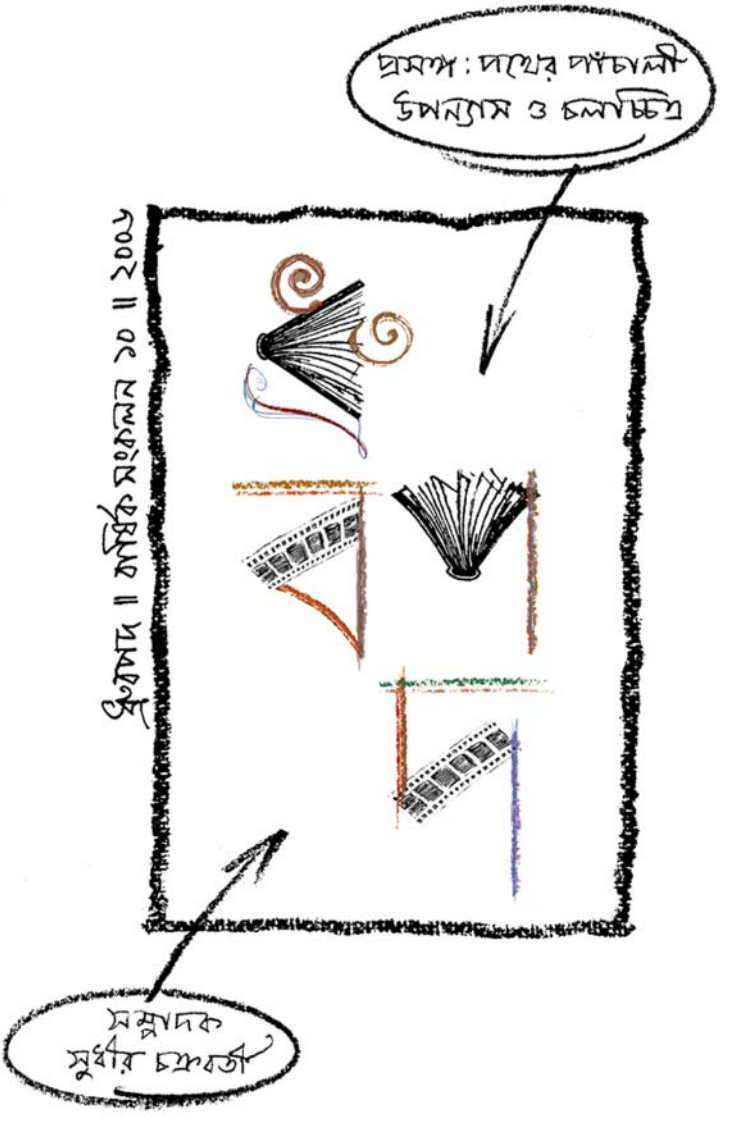

ধ্রুবপদ ॥ বার্ষিক সংকলন ১০ ॥ ২০০৬
প্রসঙ্গ : পথের পাঁচালী
উপন্যাস ও চলচ্চিত্র
সম্পাদক
সুধীর চক্রবর্তী

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।

‘দেশ’ পত্রিকায় (২ডিসেম্বর ২০২০) বন্ধুবর সৌমিত্রের স্মরণলেখ (‘আমার বন্ধু পুলু’) লিখতে গিয়ে প্রথমেই সুধীর চক্রবর্তীর মনে পড়েছিল অতুলপ্রসাদ সেনের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশটি (রচনাকাল ১৯ ভাদ্র ১৩৪১)। রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের বয়সের ব্যবধান ছিল দশ বছর। কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুধীর চক্রবর্তী সমবয়সি, তাঁদের বন্ধুজীবনও দীর্ঘ। তবে ২০১৭-য় পথ-চলা শুরু করা ‘হরপ্পা’-র সঙ্গে শ্রীচক্রবর্তীর বন্ধুতা দীর্ঘ নাহলেও ছিল গভীর। সলতে-পাকানোর দিন থেকে তিনি ছিলেন ‘হরপ্পা

প্রতিপদ

প্রতিবাদ

প্রতিবাদ

লিখন চিত্রণ' পত্রিকার অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা, উৎসাহদাতা ও উপদেশক। 'হরপ্পা'-র অগ্রসরপথ মসৃণ করতে তাঁর মৃত্যু (১৫ ডিসেম্বর ২০২০) অবধি মুদ্রিত ন-টি সংখ্যার আটটিতে শুধুমাত্র লিখেই ক্ষান্ত হননি ছিয়াশি বছরের এই প্রবীণ, পরম সুহৃদের মতো সরাসরি পত্রিকার বিপণনের মতো বিষয়েও সরাসরি সহায়তা করেছেন।

দীর্ঘ সম্পাদনা-অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধতার কারণে কোনো পত্রিকার সার্থক প্রকাশনার প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। 'ধ্রুবপদ' বার্ষিক সংকলন প্রকাশের সময় থেকেই তাঁর সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা, তার সময়োপযোগী পরিবর্তন ও রূপায়ণের সুস্পষ্ট আভাস ধরা থাকত পত্রিকার গোড়াতেই 'আত্মপক্ষ' অংশে। ১৯৯৬-এ প্রকাশিত প্রথম সংকলনে তিনি 'ধ্রুবপদ'-এর আত্মপ্রকাশ সংবাদ দিয়ে তার বিষয়বস্তু, সম্ভাব্য বাৎসরিক প্রকাশকাল ইত্যাদি জানিয়ে দেন: "প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সারা বছরের প্রস্তুতি নিয়ে সুচিন্তিত কিছু রচনা সম্ভারে এটি প্রকাশিত হবে। বিষয় অনুসারে সংকলনের অবয়ব ও আর্থিক মূল্যের তারতম্য ভবিষ্যতে ঘটতে পারে। সংকলনের প্রকাশকাল প্রতিবছরের কলকাতা বইমেলার তারিখের সংলগ্ন থাকবে।" তিনি উল্লেখ করতে ভোলেননি 'সংকলন-সম্পাদকের কোনো ব্যবসায়িক অভিপ্রায় নেই' বা 'সংকলন কোনো সাহিত্যগোষ্ঠি বা সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সামূহিক মুখপত্র নয়'। 'সম্পাদক এককভাবে এর ভালোমন্দের দায়ভাগী' বলে তিনি যেমন দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন,

প্রতিবাদ

ভোরপদ

তেমনই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছিলেন সেইসব শুভাকাঙ্ক্ষীদের যাঁরা তাঁকে 'লেখা দিয়ে, অনুদান দিয়ে বা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহায়তা করেছিলেন'।

প্রথমসংখ্যার বিষয়কেন্দ্রে ছিলেন দুই উপেক্ষিত নায়ক: সংগীতকার দিলীপকুমার রায় ও সংগীততাত্ত্বিক অমিয়নাথ সান্যাল—প্রথমজনের জন্ম ১৮৯৭ এবং দ্বিতীয়জনের ১৮৯৫। জন্মশতবর্ষে তাঁদের উপেক্ষা করার অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত যেন পরোক্ষভাবে এই সংকলন প্রকাশের পেছনে কাজ করছিল।

প্রথম বছরেই সাড়া জাগানো পত্রিকাটির দ্বিতীয় বছরে বিষয় ছিল বাংলার বাউল ফকির। অবয়ব ও বিক্রয়মূল্য ছিল অপরিবর্তিত। তবে পত্রিকাটিকে দর্শনীয় করার তাগিদে সংযোজিত হয়েছিল নন্দলাল বসু থেকে সাম্প্রতিক কাল অবধি আঁকা পঞ্চাশজন শিল্পীর চিত্র।

তৃতীয় বছর 'বাংলা গান' ছিল 'ধ্রুবপদ' সংকলনের বিষয়। সম্পাদক এই সংখ্যা থেকে বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন। প্রকাশকালও বিলম্বিত হয়— বইমেলার বদলে নববর্ষ। রদবদল হয় প্রথম সংখ্যায় ঘোষিত বক্তব্যের: "এই সংকলন কোনো সাহিত্যগোষ্ঠি বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সামূহিক মুখপত্র নয়। বছরে একবার একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ নিয়ে এর বিষয়বস্তু ও রচনাগুলি বিন্যস্ত। সম্পাদক এককভাবে এই সংকলনের ভালোমন্দের দায়ভাগী। তবে তাকে লেখা দিয়ে লেখকবৃন্দ ও অন্যান্য আনুকূল্য দিয়ে বেশ কজন এর সফলতার অংশী। সংকলনের পরিকল্পনা, লেখক নির্বাচন, লেখা সংগ্রহ,

ভূতের বাড়ি

প্রুফ দেখা, মুদ্রণের বিন্যাস এবং অঙ্গসৌষ্ঠব সবই সম্পাদকের সানন্দ কৃত্য। পাঠকদের খুশি করা নয়, এ সংকলনের লক্ষ্য কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উন্মোচন ও অবলোকন। 'ধ্রুবপদ' প্রথম থেকেই নান্দনিক দিক থেকেও সতর্ক ও সচেতন। সেইজন্য চিত্রণ কার্য, অলংকরণ, অক্ষরবিন্যাস ও বর্ণলিপির ব্যাপারগুলি সাগ্রহে করা হয়ে থাকে। আমরা স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করছি 'ধ্রুবপদ' ক্রমশই সংগ্রাহকদের পক্ষে রোচক হয়ে উঠছে।"

চতুর্থ বছরে 'আত্মপক্ষ' থেকে জানা যায়, প্রথম দু-বছরের সংকলন নিঃশেষিত, শুধু তাই নয়—'পরিমার্জিতভাবে ও নববিন্যাসে বই আকারে বার করতে হয়েছে সম্পাদককে এবং তা প্রকাশ করেছেন দুজন প্রকাশক'। প্রথম তিনবছরের সংকলন কোনো-না-কোনোভাবে গানের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও চতুর্থ বছরের সংকলনটি ছিল অভিনব—'বুদ্ধিজীবীর নোটবই'—'আধুনিক অর্থাৎ সচেতন, জিজ্ঞাসু ও সজীব মনের মানুষের জন্য বিচিত্র বিদ্যার সমাহার'। ১২৭ জন লেখক ১২১টি বিষয় নিয়ে লিখেছেন। অনেকের অংশগ্রহণে এই কোশগ্রন্থ প্রকাশের বিষয়ে প্রমথনাথ বিশীর উক্তিটি উল্লেখ করেছেন সম্পাদক: 'যে কাজ সকলে মিলিয়া করিবার কাজ বাঙালি তাহা একা করে, বাঙালি একা অভিধান লেখে'। সম্পাদক স্মরণ করেছেন তাঁর অকাল প্রয়াত সহপাঠী 'এক্ষণ'-সম্পাদক নির্মাল্য আচার্যকে, যিনি এই কাজটি শুরু করেছিলেন এবং 'ধ্রুবপদ' সে-কাজটি 'তাঁর কৃতিত্ব মনে রেখে, সম্পূরক ও পূর্ণতর ভাবে' করতে চেয়েছে মাত্র। লেখক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন শঙ্খ

অমৃত-যন্ত্রণা-র সম্পাদকীয়

ঘোষ, সৌরীন ভট্টাচার্য, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, রুশতি সেন ও অন্যান্য অনেকের কাছে যাঁরা কোনো-না-কোনো উপায়ে তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছেন। কারণ এ-কাজ তাঁর একার নয়, '১২৭টি বিচিত্র প্রসঙ্গে ও বিষয়ে ৯১ জনের রচনা সম্পাদনা করা একজনের পক্ষে ধৃষ্টতা'—তাই সে-চেষ্টা তিনি করেননি, বরং সংগ্রাহকের কাজটি করেছেন। সে-কারণে 'ধ্রুবপদ'-এর ঘোষিত বক্তব্য 'সম্পাদক এককভাবে এই সংকলনের ভালোমন্দের দায়ভাগী' এই সংখ্যাটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

পঞ্চম বর্ষে 'ধ্রুবপদ' পদার্পণ করার সময় তার বিগত সংখ্যাগুলি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। "আধুনিক জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ঘিরে সারা বিশ্বে [...] যেসব ভাবনার ঢেউ, জাগছে নানা তর্ক-বিতর্কের আমেজ—খুব সন্তর্পণে দায়বদ্ধ 'ধ্রুবপদ' হয়ে উঠছে তার ফোরাম কিংবা মননমঞ্চ"। পঞ্চম সংখ্যার বিষয় 'যৌনতা ও সংস্কৃতি'।

টানা পাঁচ বছর মূল্যবৃদ্ধি বা অন্যান্য প্রতিকূলতা স্বীকার করে 'ধ্রুবপদ' পত্রিকার দাম না-বাড়লেও ষষ্ঠ বছর একশো থেকে দেড়শো হল পত্রিকার দাম। 'আত্মপক্ষ' অংশে কুণ্ঠার সঙ্গে সম্পাদক জানালেন তা। তবে এ সংখ্যার বিষয় 'দৃশ্যরূপ'-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছবি ছাপাতে সে-খরচ বৃদ্ধি মেনে নেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। উঠে এল 'তথ্য ও সত্য, বৈপরীত্য ও স্ববিরোধ, জটিলতা ও সারল্যের গ্রন্থি' এই দৃশ্যরূপের অন্তরালে নিগূঢ় কত অব্যক্ত সংলাপ।

ষষ্ঠ সংখ্যায় 'কথার খেলাপ' করে দাম বাড়ানোর পর লেখক পরবর্তী সংখ্যা একশো টাকায় আবার দেওয়ার

বিরহের বহ্নিময় উপত্যকায় প্রেমের অনুভূতি দ্বিধা বিভক্ত। তাই পূর্ণ প্রেমের ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের শরণাগতি নিয়ে বলতে হয়:

সর্বথা ধ্বংসরহিতম্ সত্যপি ধ্বংসকারণে ।
যদ্ভাব বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥

অর্থাৎ, প্রেম বলতে অধ্বংস অক্ষয় সেই যুগল সম্পর্ককে মেনে নিতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই অক্ষয় ভাব দেহের সীমাকেও অতিক্রম করে। শেলি তাই বলেছিলেন "that to divide is not to take away". প্রেমের কবিতায় এই পরস্পর সম্পৃক্ত-অধ্বংস চেতনার অনুরাগ পরিস্ফুট। অপ্রেমের আকৃতি সেখানে ব্যর্থ হয় নিরুদ্ধ অনুভবের দিগন্তসীমাতে।

তর্ক উঠতে পারে, প্রেমে না-পড়েই কি প্রেমের কবিতা লেখা যায়? উত্তরে বলা চলে প্রেমানুভূতি সকলের। প্রেমানুভবের পিছনে সেই জাতিস্মর আসঙ্গলিপ্সা, অনন্ত উন্মুখরতা। তা সকলেই অনুভব করে। যে প্রেম পায়নি তার পরিব্যাপ্ত আকাঙ্ক্ষায় আবেগ আর সংশয়ে অনুনয়। যে প্রেম পেয়েছে তার সম্মিলনের প্রাপ্তির পুলকে আনন্দের সংখ্যাতত্ত্ব, প্রেম বৈচিত্র্যের খেলা। আর যার প্রেম ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা হারিয়ে গেছে তার শুধু পুরোনো সুরের পুনঃস্মরণ, আর্তির ক্ষেত্র জুড়ে অনুসন্ধী সে মৃত মাধুরীর কবর। এর থেকে প্রতীত হল প্রেমানুভবে যন্ত্রণাই প্রধান; সম্ভোগের সন্ত সাগরে আর হাহাকারের শ্মশানে প্রেম এক অপরাজেয় বেদনার মূর্তি। রবীন্দ্রনাথের কথায়:

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন ॥

২

প্রেম সম্পর্কে কবিদের কোন বৈকল্য না ঘটলেও প্রেমের পাত্র বা পাত্রীর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টির একটি অপ্রকৃত বিবর্তন যুগভেদে সকলেরই চোখে পড়বে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় যে বনবালা, কোলরিজ যাকে স্বপ্নময় Xanadu-র পথে পথে খুঁজে ফেরেন, শেলির কাছে যে নির্বিকল্প যন্ত্রণায় মহীয়সী- হুইটম্যান তাকেই বলেন We are two fishes swimming in the sea together. রবীন্দ্রনাথের চোখে যে অভ্যাস- সেখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাকেই খুঁজেছেন মিছিলে।

অমৃত-যন্ত্রণা-র সম্পাদকীয়

প্রতিশ্রুতি দিলেও সপ্তম সংখ্যার বিনিময় মূল্য একশো কুড়ি টাকা হয়। বিষয় নির্বাচিত হয় 'অভিজ্ঞতা'। ঘটনা নয়, অভিজ্ঞতা মানে অর্জিত বোধভাষ্য, তত্ত্ব বা দর্শন। মোট বাইশজনের বিচিত্রধর্মী ও বিপরীত ভাবনার সমাবেশ এই সংকলনে ভিন্ন ধরনের চেহারা নিয়েছে।

দাম কমেনি ২০০৪-এও। সেবার কলকাতা বইমেলাকে উপলক্ষ্য করে প্রকাশিত 'ধ্রুবপদ'-এর অষ্টম সংখ্যার বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথ'। কিন্তু আবার রবীন্দ্রনাথ কেন—এ প্রশ্নের উত্তর সম্পাদক দিয়েছেন 'আত্মপক্ষ' অংশে: "[...] রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের নানামুখী বিচ্ছুরণের শেষ নেই। যত দিন যাচ্ছে, তত তাঁর সৃষ্টির পাঠ এবং পুনর্পাঠ থেকে নতুন নতুন অনুভব হচ্ছে পাঠকের বা মননশীল ব্যক্তির—'মহাকবির কল্পনাতেও ছিল না তার ছবি।' [...] 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। সেই জানার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা'—বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কথাটি বিপরীত ভাবেও তো সত্যি—অর্থাৎ তাঁকে সম্পূর্ণত জানা আমাদের তরফে আজও ঘটেনি এবং তার ফলে আসেনি আত্মবীক্ষণের উদ্ভাস ও আত্মদীক্ষার সূচনা। তাই রবীন্দ্রনাথকে শুধু অবিনির্মাণের মধ্যে দিয়ে দেখা নয়—সেই সঙ্গে তাঁকে জানতে হবে বহুস্তরে ও ঘটনাক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে, শিল্পী ও ব্যক্তিসত্তার যুগলসম্মিলনে"।

২০০৫-এ নবম বার্ষিক সংকলনের বিষয় নারীবিশ্ব—প্রশাসনিক উচ্চপদ অধিকার করা থেকে শুরু করে সংগঠন নির্মাণ, গণআন্দোলনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে প্রতিবাদের নানা মঞ্চ গড়ে তোলা, আকাশবিহার থেকে

এর থেকে বোঝা যায় প্রেমের আধার যুগভেদেও অপরিবর্ত, কেবল আধেয়ের বিবর্তন ঘটছে কবিদৃষ্টির বিভিন্নতায়। অর্থাৎ প্রেমিক-কবি, কীট্স-এর সেই গ্রীসিয়ান আর্নের ছবির মতই যুগে যুগে নায়িকার দিকে উদ্দাম বেগে ছুটে যাচ্ছেন, কিন্তু বারবার এই বিধিলিপির দ্বন্দ্ব : Bold Lover Can'st thou Kiss, though winning near the goal.

এই বিধিলিপির-দ্বন্দ্ব প্রত্যেক শতাব্দীর কবির সহজ পরাজয়-স্বীকার। যাকে চাই তাকে ভুল করে চাই, যাকে পাই তাকে চাইনা : এটি কবিতামাত্রেরই, এর পেছনে প্রেমিকদের বৈরাগ্যের সমগ্র ইতিহাস। সমস্ত উচ্চাকিত মুহূর্তের শেষ-পরিণাম যেন : কেঁদেও পাবেনা তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

বাংলাদেশের কবিরা প্রেমসম্বন্ধে মধুমুখর ভাষায়। বাংলাকাব্যের আদিভূমি যদিও ধর্মনৈতিকসূত্রে আবিল তবু জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির ব্যক্তিমনের প্রেমমহিমা নির্বিবাদে স্থান করে নিয়েছে ধর্মসাহিত্যের মুখোমুখে।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা আর ময়মনসিংহ গীতিকার মুক্তিমান পরিসরে কত কবির ব্যক্তিবেদনার অশ্রুবিন্দু পর্যুষিত। আর বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীতে যেমন দুঃসাধ্য অভিযানের ছবি, মেঘবিজয়ে তেমনই প্রেমের পূর্ণবিকাশ। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা কবিতায় উপেক্ষিতা নায়িকাদের মুক্তিপ্রেমের রূপায়োগ। মধুসূদনের লেখনীতে বীরাঙ্গনারা তাই প্রেমের স্বরূপে বিজয়িনী। বিংশ শতাব্দীতে কবিদের ব্যক্তিমনের আবরণ উন্মোচন হল। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাংলার কবিরা এই প্রথম প্রেমেরকথা আধুনিকভাবে শুরু করলেন। বুদ্ধদেব জানালেন আমার কিশোর প্রথম তোমায় জানলাম - বিংশ শতাব্দীর একটি ব্যক্তি-মনের অসমর্থ যন্ত্রণার রক্তরাগ। জীবনানন্দের স্বপ্নাতুর চেতনা জুড়ে রয়েছে সুচেতনা-শঙ্খমালা প্রভৃতি আধুনিক যুগের নায়িকাদের স্মৃতি। সুধীন্দ্রনাথের আরেকটি অভিব্যক্তি : তোমার অভাবে অসহ্য অসীম মোর অবিশ্রান্ত বদ্ধ অন্ধকার।

বাংলা কবিতার এই প্রেমপ্রবীণ পটভূমিতে এই সংকলনের কবিদের জন্ম এবং বিকাশ। তাই এতে ব্যক্তিমনের ছাপ সুস্পষ্ট। বর্তমান সংকলনের কবিতাগুলির আঙ্গিকের দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এখন আর কবিতার শব্দ শুধু তাদের কৌলীন্য নয়, ধ্বনির দ্যোতক এবং ব্যঞ্জনার সঞ্চারী। ছন্দ শুধু কবিতার সামগ্রিকতার আঙ্গিক আনা হয়না, প্রবাহিত চেতনার অনুগত ছন্দ।

৬

অমৃত-যন্ত্রণা-র সম্পাদকীয়

রেসিং-কার চালানো, যৌনকর্মীদের সঙ্গে পথপরিক্রমা করা, কবি বা লেখক হিসেবে সতেজ কলম চালানো, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বিরোধিতা করা নারীর আধুনিক বিশ্বসমাজে অবস্থান সম্পর্কে এক বিশেষ গবেষণাধর্মী সংকলন।

২০০৬-এ এক দশক পার করে 'ধ্রুবপদ' ঘোষিত সময় অর্থাৎ জানুয়ারির শেষভাগ থেকে চারমাস পরে প্রকাশিত হয়। ২০০৫-এ চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী'র সুবর্ণ জয়ন্তী যতটা ঘনঘটায় উদ্‌যাপিত হয় ওই একই বছর উপন্যাস রচনার পঁচাত্তর বছর পূর্তি নিয়ে কিন্তু সেভাবে কোনো আগ্রহ বাঙালিমানসে দেখা যায়নি। তাই 'উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের যুগল উন্মোচনে, ৭৫ ও ৫০ বছর অতিক্রমণের আশ্চর্য মিলনবিন্দুকে স্মরণীয় করার মহান লক্ষ্যে' 'ধ্রুবপদ'-এর এই সেতুবন্ধের প্রয়াস।

একাদশ বর্ষে পত্রিকার বিষয় ছিল অন্যরকম বাঙালি—ষোলোজন ব্যতিক্রমী বাঙালির জীবন ও কর্ম নিয়ে এই সংকলন। এই সংকলনেরও দাম কমানো যায়নি। লক্ষণীয় সম্পাদকের লেখক-তালিকায় অন্তর্ভুক্তিও।

২০০৮-এ 'ধ্রুবপদ'-প্রকাশের একটি যুগের অবসান হল—ছ-মাস বিলম্বে প্রকাশিত পত্রিকার দ্বাদশ এবং শেষ সংকলন—বিষয়: 'গবেষণার অন্তরমহল'। গবেষণার 'স্পন্দমান নেপথ্যলোক'টি তুলে ধরাই ছিল সংকলনের লক্ষ্য।

দ্বাদশ সংকলনটি প্রকাশ করে সম্পাদক ঘোষণা করেন দপ্তর বন্ধের কথা। জানান দেন এই বারো বছরের অভিজ্ঞতায়

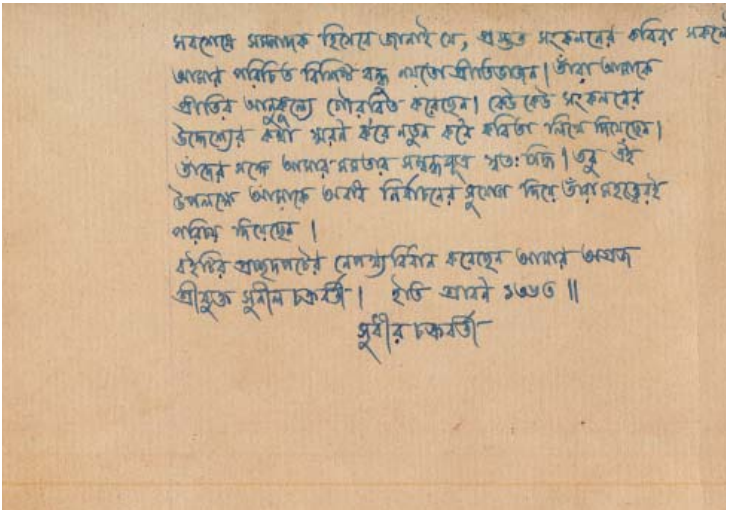

সবশেষে সম্পাদক হিসেবে জানাই যে, প্রস্তুত সংকলনের কবিরা সকলে
আমার পরিচিত বিশিষ্ট বন্ধু এবং প্রীতিভাজন। তাঁরা আমাকে
প্রীতির আনুকূল্যে গৌরবান্বিত করেছেন। কেউ কেউ সংকলনের
উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে নতুন করে কবিতা লিখে দিয়েছেন।
তাঁদের সঙ্গে আমার মমতার সম্বন্ধসূত্র স্বতঃসিদ্ধ। তবু এই
উপলক্ষে আমাকে তাদের নির্বাচনের সুযোগ দিয়ে তাঁরা মহত্ত্বেরই
পরিচয় দিয়েছেন।
বইটির প্রচ্ছদপটের নেপথ্য বিধান করেছেন আমার অগ্রজ
শ্রীযুক্ত সুনীল চক্রবর্তী। ইতি শ্রাবণ ১৩৬৩ ॥
সুধীর চক্রবর্তী

অমৃত-যন্ত্রণা-র সম্পাদকীয়

অমৃত-যন্ত্রণা-র প্রচ্ছদ *শিল্পী: সুনীল চক্রবর্তী*

তাঁর ছিল না কোনো ‘ব্যর্থতা বা অক্ষমতা’, ‘আছে ব্রতপালনের সিদ্ধি, সময়োচিত সংবরণ ও সাফল্যের আত্মপ্রসাদ’। প্রথম সংখ্যায় যে ঘোষিত বার্তা ছিল তা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি। পত্রিকা কোনো গোষ্ঠীর মুখপত্র হয়নি, লাগেনি রাজনৈতিক ছোঁয়াচও। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য না-থাকায় উদ্বৃত্ত অর্থ পাঁচটি সংগঠনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি, পরে তা রক্ষাও করেন।

সফলভাবে বারো বছর পত্রিকা চালানোর পর ঘোষণা করে পত্রিকা বন্ধের নজির রাখা সম্পাদক হিসাবে সুধীর চক্রবর্তী অবশ্যই লেখক নয় সম্পাদক হিসেবেও অনুকরণীয়। শূন্য থেকে শুরু করে তিনি মাত্র বারো বছরে পত্রিকাটিকে এমন সাফল্যের চূড়ায় তুলেছিলেন যে পত্রিকা চলাকালীন বিগত সংখ্যাগুলির বেশ ক-টি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছিল, প্রকাশিত হয়েছিল ‘নির্বাচিত’ সংকলনও।

এমন সফল সম্পাদকের কাজ-শেখার সূচনা হয়েছিল অনেক আগেই কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে। ১৯৫৩-তে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হিসাবে কলেজ-পত্রিকা সম্পাদনার গুরুভার বর্তায় তাঁর ওপর। তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। তাঁর কাছেই হাতেখড়ি লেখা নির্বাচন, কাটছাঁট করা, প্রুফ দেখার। ‘১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা’ পত্রিকার জুন ২০১৫ ও ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় ‘সম্পাদকের কত কথা’ শীর্ষক স্মৃতিমালায় তিনি তুলে ধরেছেন সে অভিজ্ঞতার কথা: “প্রায়ান্ধকার ঘর, কম্পোজিটারের মাথার ওপর ঝুলন্ত টিম টিম করা বালব।

সামনে সাজানো মায়াবী বাক্স। তার খোপ একেক সাইজের। কালি ঝুলি, শিসের টাইপ, কেরোসিনের গন্ধ। গ্যালি, প্রুফ, প্রিন্টিং মেসিন।" সে-অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছিলেন ট্রেডেল মেশিন পায়ে চালানো হয়, বড়ো ফ্ল্যাট মেশিন বিদ্যুতে চলে। শিখেছিলেন পেজ মেক-আপ, টাইপের পয়েন্ট-সাইজ চেনা, প্রুফ দেখা। হাতেকলমে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারেন 'স, ক আর ন' হরফগুলো ছাপার কাজে সব থেকে বেশি ব্যবহার হয়, সব থেকে কম 'ণ, ৎ, ঋ আর ঙ'।

এর পরে স্থানীয় 'হোমশিখা' পত্রিকায় সহ-সম্পাদনার কাজ করেন, হাতখরচ হিসেবে পেতেন পঁচিশটি টাকা। কাজটিতে আগ্রহ আর শেখার অদম্য বাসনা তাঁকে সম্পাদক হিসেবে তিলে-তিলে তৈরি করেছিল ভবিষ্যতের জন্য। পরবর্তী সময়ে তিনি সান্নিধ্য পেয়েছেন পুলিনবিহারী সেন, সাগরময় ঘোষ প্রমুখ স্বনামধন্য সম্পাদকদের। 'এক্ষণ'-সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী।

সহপাঠীরা সংঘবদ্ধ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রকাশ করেন ন-জন কবির কবিতা সংকলিত হাতে-লেখা কবিতার বই *অমৃত-যন্ত্রণা*—এটি সুধীর চক্রবর্তীর প্রথম স্বাধীন সম্পাদিত বই। ডিমাই সাইজের বইটিতে হালকা নীল কনকোয়েস্ট কাগজের ওপর হাতের লেখাটি ছিল তাঁর বিখ্যাত সহপাঠী শিশিরকুমার দাশের। প্রচ্ছদটি এঁকেছিলেন দাদা সুনীল চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে এটি মুদ্রিতও হয়েছিল। হাতে-লেখা সংস্করণে ন-জনের কবিতা থাকলেও মুদ্রিত সংস্করণে কবির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় সতেরো। কবিদের নামে চোখ বোলালেই

বোঝা যাবে সম্পাদক হিসেবে লেখক (কবি) নির্বাচনের প্রথম প্রয়াসেই তিনি কতটা সফল ছিলেন। পরে অধ্যাপক হিসেবে তিনি সরকারি মহাবিদ্যালয়ে পড়ালেও নানা সময়ে জড়িয়ে পড়েছেন 'শিলাদিত্য' বা 'পরিবর্তন'-এর মতো বাণিজ্যিক পত্রিকার সম্পাদনার কাজে। সম্পাদনা করেছেন বহু আকর গ্রন্থ। আর 'ধ্রুবপদ'-এর বারোটি বার্ষিক সংকলনের গুরুত্ব আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

তাঁর জন্ম হাওড়ায়। বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, কর্মজীবন, গবেষণা লেখালেখি নানা সূত্রে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালেও তাঁর জীবনে প্রধান অবদান দুটি শহরের—ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণনগর ও মেট্রোপলিটান কলকাতার। তাই তিনি তাঁর জীবনকে অশীতিপর পর্বে মনে করতেন *A Tale of Two Cities*। শুধু সদর বা মফস্‌সল নয় জীবনের নানা পর্বে বিভিন্ন গ্রামে মেলায় ঘোরা, হরেক মানুষের সঙ্গে মেশা, কথা বলা তৈরি করেছিল শুধু তাঁর লেখক নয় সম্পাদক সত্তাকেও: "ভালো মাপের গবেষক বা লেখক হতে গেলে শুধু নয়, দক্ষ সম্পাদক হতে গেলেও লাগে গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর গ্রাম শহরের মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গ। শুধু নাগরিকতা দিয়ে একটি জাতিপরম্পরা ও তার যাপনের মর্ম সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয় না, জানতে হয় তার শিকড়, যা ডালপালা মেলে পুষ্পিত ও ফলবান হয়ে থাকে গ্রামীণ জনবৃত্তে। অন্তত আমাদের বাংলাদেশের আসল প্রাণ-ভোমরা লুকিয়ে আছে পল্লিজীবনে তথা পল্লিমানসে। আমার সম্পাদক সত্তার বিকাশ ও শুশ্রূষায় বেশ ক'বছরের সরেজমিন বহু বহু গ্রাম পরিক্রমার অনাবিল আনন্দ জড়িয়ে আছে।"

এসব কারণে শুধু সম্পাদক নন তিনি লেখক হিসেবেও ছিলেন যে-কোনো পত্রিকার সম্পদ। অনায়াস দক্ষতায় দ্রুত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি উপস্থাপন করতেন কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি। ব্যঙ্গ শ্লেষ হাস্যরস কথকতা গল্প বিবরণ দর্শন মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত তাঁর পরিবেশনা গুণে।

হঠাৎ মনে পড়ে কোনো দুপুরে পাশাপাশি শুয়ে তাঁর কাছ থেকে শোনা একটি গল্পের কথা। ভোজনরসিক সুধীরবাবু এক রাতে নেমতন্ন খেয়ে বাড়িতে ফিরে দেখেন তাঁর বাবা জেগে আছেন। কনিষ্ঠ পুত্রের কাছ থেকে তিনি জানতে চান কী কী পদ ওই বাড়িতে হয়েছিল। শুনতে-শুনতে অধৈর্য হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "সন্দেশ করেনি?" সেদিনের মেনুতে সন্দেশের অনুপস্থিতির কথা শুনে তিনি বড়োই ব্যথিত হয়ে সুধীরবাবুকে তৎক্ষণাৎ বলেন, "আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও"।

যে-কোনো পত্রিকায় অনেক রচনার মধ্যে সুধীর চক্রবর্তীর লেখাটি সর্বদাই লেখকের প্রসাদগুণ এবং উপস্থাপন দক্ষতায় হত অনন্য—ঠিক ভোজবাড়ির সন্দেশ-এর মতো। হয়তো সহৃদয় পাঠকও ভবিষ্যতে ওঁর লেখার অনুপস্থিতিতে একইভাবে হতাশ হবেন।

গভীর নির্জনে

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭
রঙ্গন চক্রবর্তী ৪৩
সুশোভন অধিকারী ৫১
অশোককুমার কুণ্ডু ৫৭
দেবাশীষ দেব ৬৫
দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ৭৩
দেবাশিস বসু ৮৩
কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত ৯৯
স্বপনবরণ আচার্য ১০৭
রামকৃষ্ণ দে ১১৩
পিয়ালী রায় ১৩৩
নন্দিনী নাগ ১৪৯
সুবীর সিংহরায় ১৬৭
জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি ১৮৩

সুকুমার ঘোষ কবিতার একনিষ্ঠ সাধক। ব্যাপক অধ্যয়নের দীপ্তি তাঁর কাব্যকে শুধু বর্ণে উজ্জ্বল করেনি, বেদনার সংঘাত তাঁকে দিয়েছে অনুদ্বেল গভীরতা। আত্মসংবৃত্তির নির্জনতাকে ভালবেসেও তিনি বৃহৎ মানবের হাহাকারের সঙ্গে যুক্ত। এই বোধি গভীরতার সঙ্গে যুক্ত তাঁর কারুকর্মনিষ্ঠা। ছন্দ ও অন্যান্য অলংকারের পরিচর্যায় তিনি অতন্দ্র। এই দুয়ের সমন্বয়ে এক বলিষ্ঠ সমগ্রতায় তাঁর কাব্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ॥

সমীর চক্রবর্তী কবিতার সচেতন রূপকার। বাংলা কবিতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে বৈরাগী যৌবনের মোহে তিনি কবিতাসাধনায় ব্রতী। তুরী, যৌবনের চারুচন্দ্রকলায় তাঁর কাব্য ভূষিত নয়, রূপজের অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যলোক বিচ্ছুরিত। ঐতিহ্যের খনিজের সন্ধানে তিনি বিচরণশীল সংস্কৃত সাহিত্য বেলায়; ইতিহাস ও পুরাণের পথে তিনি অক্লান্ত পথিক, মননিবিড় কাব্যবন্ধনেই তাঁর মুক্তি। রুগ্ন রোমান্টিকতার তীব্র প্রতিবাদ তাঁর কাব্যে ॥

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় গদ্যকবিতার কুশলী শিল্পী। সমরসেনের পর পুরো গদ্যছন্দ অনায়াস করেও শব্দ নির্বাচন ও বাক্যবিন্যাসের মধ্যে অনুভূতির কড়ি ও কোমল উভয় সুরই প্রকাশসমর্থ। শব্দের ভারসাম্য রক্ষার নৈপুণ্য কবিতাগুলিকে বহুক্ষেত্রে সুরক্ষিত করেছে। তাঁর কবিতার মননের তীব্রতায় গত কয়েক দশকের রুচির অনুপস্থিতি। চমকেমী বুদ্ধিমত্তার স্তর নয়, বলিষ্ঠ পৌরুষ ও আত্মত্যাগের সহজ সততা ও বিশ্বাস, হাহাকারে ও সংগীতে তাঁর কাব্য উদ্ভাসিত ॥

শীতল চৌধুরী সম্পূর্ণ সুর বিযুক্ত গদ্য কবিতা রচনায় প্রয়াসী। তাঁর মনন স্থির ও সূক্ষ্ম। সত্যবস্তুর অন্তর্নিহিত রূপলোকেই তিনি পরিতৃপ্ত। চেতনার প্রাত্যহিক স্তর ছাড়িয়ে কল্পনালোকের বিচিত্র রহস্যলোকে তাঁর আসক্তি। এই শতকের অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা তাঁর কাব্যে মূর্ত কিন্তু তাঁর চেতনার অনুষঙ্গে এক অনন্য লোকের রূপ নিয়েছে — যেখানে হতাশার হাহাকার থেকেও কোমল শান্তির ছায়াঘনতা। এই অন্তিম দৃষ্টির আলোকে স্নিগ্ধতা ও মূর্ত অন্তর গভীরতা তাঁর কাব্যের সম্পদ ॥

শিশির কুমার দাশ মুখ্যতঃ প্রাচীন ছন্দকবি হয়েও, শুধুই স্মৃতি কাব্যশাখার প্রতি গমনের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ হয়ে উপহসিত হতে অনিচ্ছুক। তাই সাধনার ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চিত মর্যাদা জেনেও সতর্কনিষ্ঠ। সম্ভবত এই তাঁর কাব্যের পরম পরিচয় ॥

২৮

অমৃত-যন্ত্রণা-র কবি পরিচিতি

শি বা জী ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

বিশ শতকের আটের দশক, শেষের দিক। ‘বারোমাস’ পত্রিকার সম্পাদক অশোক সেনের মহানির্বাণ রোডের বসতবাড়িতে সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ আলাপ। ওই চাক্ষুষই; কেননা, সেদিন আমি ছিলাম দুই সহমর্মীর মজলিশি বিনিময়ের নীরব শ্রোতা মাত্র। জানতাম, সুধীর চক্রবর্তী বাংলার বহুশাখ লোকায়ত যাপন ও মননচর্চার অনলস গবেষক, এবং, অশোক সেন সেই বিরল বর্গের যাচনদার যিনি সদাই টাটকা নতুন ‘জিনিস’ ঘরে তুলতে অধীর। ওঁদের হাসি-আড্ডার বোবা সাক্ষী হওয়া বাদে গত্যন্তর ছিল না আমার।

লেখকের বাড়িতে সুমন মুখোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণ ঘোষ ও লেখক

অবশ্য, স্রেফ চক্ষু-কর্ণ মারফতি এ সাক্ষাতের আগেই সুধীর চক্রবর্তীর বেশ ক-টি বই পড়েছিলাম—*সাহেবধনী সম্প্রদায়: তাদের গান* (১৯৮৫), *বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান* (১৯৮৬), *গভীর নির্জন পথে* (১৯৮৯)। যত-না সুধীরবাবুর গদ্যশৈলী, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি মুগ্ধ, চমৎকৃত হয়েছিলাম, ভদ্র-প্রেক্ষিতে প্রান্তিক যারা, কোণঠেলা, তাদের সম্বন্ধে আমাদের অবজ্ঞা কিংবা অনুরাগের পরম্পরাগত সংস্কারের ওপর তাঁর নির্মোহ আঘাতের স্পর্ধায়। আর দশ জনের মতো তখনও আমার অজ্ঞাত, আরও কত বিস্ফোরক, বহুমাত্রিক হতে চলেছে সুধীরবাবুর কৃত্যসূচি। তবে, ভালোই ওয়াকিবহাল ছিলাম, অক্ষরতই তিনি 'আপাদমস্তক' গবেষক—তাঁর মস্তিষ্ক-জারিত তত্ত্বভাবনার আদত ভর অবিরত পদবিহার। পা-জোড়া যেন সর্ষে-হলুদ—পশ্চিম বাংলার এ-গাঁ সে-গঞ্জ, এ-আখড়া সে-মাজার, নানা প্রত্যন্তদেশে ঘুরে-ফিরে সরেজমিন তদন্তে ভরান-বাড়ান তিনি তাঁর তথ্যভাঁড়ার।

সুতরাং, সেদিনের সে খোশবৈঠকে, সুঠামদেহী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুধীর চক্রবর্তীর সবল চরণযুগলেই নিবিষ্ট ঘনসংহত ছিল আমার নিঃশব্দ বিস্ময়ধ্যান।

১৯৯৫-৯৬। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে অতিথি-অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী। অধ্যাপনার বিভাগীয় বৃত্তে আমিও মজুত। ওই সময়-পরিসরেই ওঁর সঙ্গে আমার সান্নিধ্যের সূচনা। মোলাকাতের আদিমুহূর্তে সুধীরবাবুর রসবোধের যা ঝলক দেখেছিলাম, এবার তা কেমন ক্ষণে-অক্ষণে ঝলসে ওঠে

তার হাতেনাতে প্রমাণ পেলাম। কৃষ্ণনগরের মানুষ সুধীরবাবু, খাঁটি কৃষ্ণনাগরিক—রগুড়ে গুলতানিতে তালিমি দখল, কথা-বেকথায় তাল-ফাঁকে ছুটতানে ফুট ঠুকতে সাতিশয় পারঙ্গম। কত যে মজাদার গপ্প, টুকরো চুটকি গজগজ ক'রত ওঁর মাথায়, চটপটিয়ে চলে আসত জিবের ডগায়, ইয়ত্তা নেই তার। দেশে অন্নজলের হোক, স্বভাব-বাতিক কিন্তু ভাষাদুরস্ত বাঙালির তখনও অনটন ঘটেনি—সুধীরবাবুর কল্যাণে লব্ধ এ সুখস্বাদটি, ইদানীংকার বাংলা-ভোলা আকালে, এমন-কী শ্বাসরোধী করোনা-করালেও, আমার আশ্বাসবিশেষ। অন্যের স্বর-নকলে নাটকীয় পরিবেশ রচনায় দক্ষ, কিন্তু, পেশকারি খেলো ভাঁড়ামি, সস্তা উপহাসে আবিল নয় আদৌ—এ-হেন দুর্লভ পরিবেশনার কুশীলব ছিলেন সুধীরবাবু। প্রসিদ্ধ দুই সংগীতবোদ্ধা, সারঙ্গদেব নামআড়ালে রাজ্যেশ্বর মিত্র ও অবিমিশ্র কৃষ্ণনাগরিক অমিয়নাথ সান্যাল-এর আশ্চর্য যে কথোপকথনখান আমাদের শুনিয়েছিলেন তিনি, তার কমিক আবেদন কস্মিনকালে ম্লান হওয়ার নয়। তাঁর স্মৃতির অতল থেকে জীবন্ত চরিত্রের প্রচ্ছদে যেমন হাজির হতেন দিলীপকুমার রায়ের দুই প্রিয় শিষ্য-শিষ্যা গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিয়ত তর্কমল্লে রত খোদ দিলীপকুমার, সাহিত্যতত্ত্বনিধি শিশিরকুমার দাশ, উদাত্তকণ্ঠ দেবব্রত বিশ্বাস এবং আরও অনেকে। সুধীরবাবুর চয়ন-নিরিখে প্রত্যেকেই এঁরা রকম-বাহারে উৎকেন্দ্রিক, স্বীয় মতির গতিতে অনন্য।

এই গল্পগাথার সূত্রেই আবিষ্কার করি সুধীর চক্রবর্তী শুধু সুগায়ক নন, বিভিন্ন সুরধারার তবিলদারও। সর্বসমক্ষে

তা দর্শাতেই, ১৯৯৬-তে, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের লাইব্রেরিকক্ষে বসে গানের আসর। খোলে তোষাখানা—সুরে খোদাই-করা সুধীরবাবুর মগজ থেকে উৎসারিত হয়ে শ্রোতৃ-সমবায় পরের পর উপহৃত হয় বাংলার বহুবিধ সংগীতঐতিহ্যের উদাহরণে; ঘরানাভেদে কীর্তনের রূপবৈচিত্র্য, নদীর জলভেজা রাস্তার রেণুমাখা লোকগানের অপার বিস্তার, রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী, কান্তগীতি, নজরুলগীতি, দৈলিপিকী, কী ছিল না সে ফর্দে। সভার অন্তে ছিল দিলীপকুমার রায় রচা অতিরিক্ত দুরূহ এক দৈলিপিকী। আজও কানে বাজে, রবীন্দ্রনাথের সুরদারির অভিনবত্ব বোঝাতে, সুধীরবাবুর গলায় 'আলোর কমলখানি কে ফুটালে' ও তার একেবারে শুরুতে 'আলো'য় পরিমিত অথচ সূক্ষ্মজটিল তানকর্তবের প্রয়োগ-মহিমা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, "এভাবে যে আলো ফোটানো যায়, রবীন্দ্রনাথের আগে কে জানত"।

অল্পদিনের মধ্যেই হাতে আসে সুধীরবাবুর *গানের লীলার সেই কিনারে* (১৯৮৫)। এর অন্তর্গত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রসংগীত: বাংলা গানের সর্বনাশ ও সর্বস্ব'-এ, যাকে বলে, মাৎ-মোহিত আমি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাট্য তথা নৃত্যনাট্য *চণ্ডালিকা*-য় বুদ্ধপরিকর আনন্দ সমীপে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি-র সংসক্ত নিবেদন "আমার সর্বনাশ, আমার সর্বস্ব তুমি" যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আধুনিক বাংলা গানের কলাবিদদের বেদনাসিক্ত স্বীকারোক্তি হিসেবেও গ্রাহ্য, এ উদ্‌ভাসনে প্রভূত উপকৃত হই। এরপর পড়ি *বাংলা গানের চার দিগন্ত* (১৯৯২), *নির্জন এককের গান: রবীন্দ্র-সংগীত* (১৯৯২)।

ক্রমশ অনুভব করি, সুধীর চক্রবর্তীকে কেবল লোকজীবনের আখ্যানকার আখ্যায় দাগিয়ে দেওয়াটা মস্ত ভুল—তিনি একইসঙ্গে সংগীতপথের অন্বেষক, মরমী গবেষক। ওই দ্বিমুখী চারণেরই অভ্রান্ত সাবুদ, ১৯৯৬ থেকে ২০০৮, তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ধ্রুবপদ' পত্রিকার বারোখানি বার্ষিক সংখ্যা। 'ধ্রুবপদ'-এর শুরুয়াত দিলীপকুমার রায় ও অমিয়নাথ সান্যাল সম্পর্কিত পৃথুল প্রবন্ধ-সংকলনে; দ্বিতীয়টি, 'বাংলার বাউল-ফকির' (১৯৯৭)।

'বাংলার বাউল-ফকির' অধ্যয়নে আমি যা আলোড়িত হই তা এ-তক্ স্তিমিত হয়নি। তুমুল সে ওলটপালটকে জিইয়ে রেখেছে, পরে পড়া, *বাংলা দেহতত্ত্বের গান* (১৯৯০) অন্তর্গত সুধীরবাবুর 'ভূমিকা' ও তাঁরই *ব্রাত্য লোকায়ত লালন*-এর পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৯৮)—দুটিই গদ্যের স্বাদে-তারে লা-জবাব।

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে আভিধানিকরা দ্বিধাবিভক্ত।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* অনুসারে:

- সংস্কৃত 'বাতুল' থেকে প্রাকৃত 'বাউর' বা 'বাউল'-এর উদ্ভব, মানে যার 'পাগল'।
- অন্য ঘুরপথে, সংস্কৃত 'ব্যাকুল'-এর প্রাকৃত অপভ্রংশ 'বাউল', মানে যার 'কাতর'।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান অনুযায়ী:

- 'বাউল'-মূলে আছে সংস্কৃত 'বাতুল'; মানে, 'পাগল'।
- সংস্কৃত 'বায়ুঃ' থেকে 'বাউর' হয়ে 'বাউল'-এর স্বপ্রকাশ; মানে, 'বায়ুরোগগ্রস্ত'।

• এমনও সম্ভব, 'বাউল'-এর প্রাচীনতর রূপ 'বায়ুর'।

মোটকথা, 'বাউল'-এর জন্মকাহিনী ধোঁয়াশালীন।

তবু, এ প্রায় নিশ্চিত যে 'বাউল' শব্দের প্রথম আগম ১৬ শতকে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত মহাগ্রন্থ *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর 'অন্ত্যলীলা' ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে। ওতেই আছে নীলাচলে ঠাঁইগাড়া চৈতন্যদেব উদ্দেশে নদিয়া হতে প্রেরিত অদ্বৈত আচার্য-এর "তর্জ্জা প্রহেলী"র প্রসঙ্গ। ধন্ধময় সে প্রহেলীর তাৎপর্য ধরতে চৈতন্য যে চৈতন্য তিনিও নাকাম: "আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ"। তবে, না-বুঝলেও, অদ্বৈত-এর পত্রে রাহসিক কী ইংগিত ছিল কে জানে, বিহ্বলতার ঘোর লাগে চৈতন্যদেবের: "উদ্‌ঘূর্ণাদশা হৈল উন্মাদলক্ষণ"। যে হেঁয়ালির অভিভবে বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রধানতম সংগঠকের "কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাঢ়িল" সেটি ছিল এই:

বাউলকে কহিয়—লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল।।

আর কিছু না হোক, "তর্জ্জা"য় যে যুগপৎ অদ্বৈত আচার্য ও চৈতন্যদেব 'বাউল' নামসংকেতে অভিহিত, এটুকু ঠাহরে অসুবিধে নেই।

এসব সত্ত্বেও না-মেনে জো নেই, আধুনিক মানসে বাউলের যে ভাববিগ্রহ দৃঢ়প্রোথিত, তার নির্মাতা রবীন্দ্রনাথ। আত্মভোলা, একলা-চলা মনপথিক সে—চোখের আলোয় চোখের বাহিরকে নয়, জগৎকে হেরে সে অন্তরের আলোকে। রবীন্দ্রনাথের *ফাল্গুনী*

(১৯১৬) নাটকের অন্ধ বাউল এরই এক প্রোজ্জ্বল নিদর্শন—হাতে একতারা, গানে-গানে পথ কেটে এগোয় যে। ধাতুরূপে রবিবাউল "অনাদরের অচিহ্নিত স্বাধীনতায়" মুক্ত, "অন্ত্যজ, মন্ত্রবর্জিত" (*পত্রপুট*, 'কবিতা ৮', [১৯৩৬])—যেন, বহুদূর অব্দি কবিরই যুগ্মসত্তা সে, বন্ধুতায় অভিন্নহৃদয়।

রবীন্দ্র-নির্মিতিটিকে সসম্মান বরণে কুণ্ঠা নেই সুধীর চক্রবর্তীর। মানতে দোনোমনো নেই তাঁর, লালন ফকির, গগন হরকরা যথা আউল-বাউল যে ক্রমশ অনাদরের বদ্ধতা ঘুচিয়ে উচ্চবর্গীয় সমাজে মান্য-বরেণ্য হন তার চোদ্দোআনা কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। সুধীরবাবুর প্রেরণাতেই, উক্ত 'উদ্ধার'-এর নেপথ্যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার যা ইতিবৃত্ত, তা অনুধাবনের গরজ জোরদার হয়।

এ কী! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদক, দরিদ্রদরদী অক্ষয়কুমার দত্ত-এর *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* ১-ম খণ্ড (১৮৭০) যে 'বাউল' সম্বন্ধে যাচ্ছেতাই উড়ো খবরে ভরতি। বাউলদের পরিধেয় না-কি বেছে-বেছে শববস্ত্র; তৎউপর, ওদের প্রত্যেকে অক্ষরশই আস্ত নরখাদক! সে 'সাঁই' হোক বা 'আউল', 'সাধ্বিনী', 'সহজী' বা 'সখীভাবক', অক্ষয়কুমারের কাছে তামাম 'গৌণ' সম্প্রদায়ই ঘৃণার্হ। এর মধ্যে আবার তাঁর তীব্রতম বিরাগের লক্ষ্য 'বাউল'। একেবারে বরদাস্ত হয়নি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র মেধাবী অভিভাবকের বাউল-দেহতত্ত্ব। সত্যি তো, শোণিত-শুক্র-মল-মূত্র, চার এই দেহ-নির্গত পদার্থকে যারা 'চন্দ্র' নাম দেয়, কায়াবাদী সাধনতন্ত্রের অজুহাতে 'চারি চন্দ্রভেদ'-এর পাল্যঅঙ্গ হিসেবে ওই সকল নিষ্কাশিত বস্তুকে

শরীরে পুনঃগ্রহণ করে, তাদের কোন্ আক্কেলে সুভব্য কেউ সমর্থন ক'রবেন। *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*-ভুক্ত সুধীর চক্রবর্তীর 'ভূমিকা' পাশে না-থাকলে আমিও হয়তো অক্ষয়কুমারের মতো লোকায়ত কায়াবাদ জিনিসটিকে ঘেন্নায় পাশ কাটিয়ে যেতাম, জানতেও পারতাম না বাউলগানের গরিষ্ঠঅংশ দোভাঁজি—তার উপরতল যদি সর্ববোধ্য, তবে নিচতল গোপ্য সকেতবহুল, 'চারি চন্দ্রভেদ'-এ নিহিত আছে যৌন-অভিচারণ বৃত্তান্ত, প্রবৃত্তি তথা নিবৃত্তি বিষয়ক নানান সদ্‌বিমর্শ।

বাউলজগৎ কামগন্ধে ম-ম, সাংঘাতিক কদর্য, স্থির এ প্রত্যয়ে, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও কাঠশরীয়তি রেয়াজউদ্দীন আহমদ বে-সাম্প্রদায়িকতায় একছত্র। ১৮৯৬ সনে, "aristocratic Brahmiinism"/'অভিজাত ব্রাহ্মণ্যবাদ'-এর প্রতিভূদের আহ্বান জোগান যোগেন্দ্রনাথ, তাঁরা যেন 'বাউল' নামক অবাঞ্ছিত উপদ্রবটিকে মানবসমাজ থেকেই নিকেশ-উচ্ছেদে মাঠে-ঘাটে কোমর বেঁধে নামেন; "নাপাক জিনিস ভক্ষণে" প্রমত্ত যারা তাদের "বিষম ধোকার জাল"-এ যাতে "মূর্খ মোছলমান"রা না জড়ায়, সে-উদ্দেশ্যে, ১৯২৫ সনে রেয়াজদ্দীন ছাড়েন *বাউল ধ্বংস ফতোয়া*। অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন, তেমনি রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠ ক্ষিতিমোহন সেনও বাউল-জীবনপ্রণালী সম্পর্কে ছিছিৎকারময়। বলতে শুনি তাঁকে, ১৯৪৯-এর *বাংলা বাউল* বক্তৃতায়, "বাউলদের দেহ-সাধনায় চারি চন্দ্রের ভেদ...অতি বীভৎস"। ওই ভাষণেই জানান ক্ষিতিমোহন, তবে মন্দের ভালো, ছোটোলোকি যৌনাচার পার, বেশ কিছু "উচ্চ ভাব-সাধনওয়ালা বাউল"ও রয়েছেন।

কত "উচ্চ" হতে পারে সে "ভাব", তার নমুনাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে শোনান ক্ষিতিমোহন, মদন বাউলের কবিতা। প্রথম যৌবন থেকেই বাউলগীতির সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচিতি সত্ত্বেও, মদন-কাব্যে, বিশেষ, 'নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে" শুনে, রবীন্দ্রনাথ তো, যাকে বলে, টরেটম। *নকসী কাঁথার মাঠ*-এর কবি জসীমউদ্দীন-এর *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়* (১৯৬১) পাই সংবাদ, জসীমউদ্দীন নিজেই, তিনের দশক শেষ নাগাদ সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, 'মদন বাউল' ব্যাপারটি আদ্যোপান্ত ভেজাল, রবীন্দ্র-কাব্যেরই এ-ছত্র সে-ছত্র ভেঙেচুরে সাজানো-বানানো 'মদন' নামাঙ্কিত কবিতাবলি। বিচলিত হলেও, এ নিয়ে গোলমালে ভিড়তে চাননি রবীন্দ্রনাথ। কারণ ততদিনে বোধহয় নিভৃতচারী, পীতবসনধারী, চন্দ্রাহত অথচ নিরাসক্ত বাউলের মূর্তি তাঁর হৃৎকমলে স্থায়ী আসন পেতে বসেছিল—১৯৩০-এ, অক্সফোর্ডে তাঁর *The Religion of Man* বক্তৃতামালায় বিশ্বমানবিকতার অক্ষয় নজির হিসেবে বিশ্বদরবারে মদন বাউল 'লিখিত' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পেশও যে সম্পন্ন। এ-সবের আড়াই দশক পর—রবীন্দ্রনাথ তখন প্রয়াত—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (১৯৫৭) বইয়ে মদন বাউল প্রসঙ্গেই তোলেন অভিযোগ, "বাংলার এ কোন্ অবাস্তব বাউলদের কথা [ক্ষিতিমোহন] আমাদিগকে শুনাইতেছেন?"

অনস্বীকার্য অবশ্য, হরিনাথ মজুমদার—১৮৮০ সালে যিনি কাঙ্গাল হরিনাথ ভেকে 'সক'-এর এক বাউলদলের অগ্রণীপুরুষ—সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'-য় সেই ১৮৭২-এ ছাপা প্রথম

প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও আরও অনেকের অবদানে বিশ শতকে লালন শা-র জাতিবর্ণ বিরোধিতার মর্ম ও কাব্যকীর্তির সমঝদারি ক্রমশ স্ফুট, বিকশিত হয় ভদ্র লোকমণ্ডলে। এখনও অবিস্মরণীয়, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত তাঁর 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে লালন ফকিরের 'আছে যার মনের মানুষ আপন মনে' ও 'এমন মানব-জনম আর কি হবে?' আগাগোড়া উদ্ধৃতিপূর্বক, গ্রাম্যকাব্যের অপটুতায়, ছন্দগত এলোমেলোমিতে নিঃসন্দিগ্ধ উন্নাসিকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কষা কটাক্ষ, "সাধু প্রসাধনে মেজে-ঘষে [এদের] শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো" (*ছন্দ*, সম্পাদনা: প্রবোধচন্দ্র সেন)।

সুধীর চক্রবর্তীর দিগ্‌নির্দেশ অনুসরণ ক'রেই, উপরোক্ত তথ্যের ক-টি চুনে-গেঁথে ২০১৪-য় লিখি 'আমাদের বাউল-পর্যটন' (*আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার*, ২০১৫ সংস্করণে যুক্ত)।

'ধ্রুবপদ'-এর পরপর তিন বার্ষিকীতে—'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' (২০০০), 'যৌনতা ও সংস্কৃতি' (২০০১), 'দৃশ্যরূপ' (২০০২)—সুধীরবাবুকে সরাসরি সাহায্যের সুযোগ পাই। বুঝি, কারে কয় জনসংযোগ।

'নোটবই' ছিল সুপ্রচুর পারিভাষিক পদ বিষয়ে অনেকানেক বুদ্ধিজীবীর সংক্ষিপ্ত আলোচনার সম্ভার; ছিল তাতে সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও গঠনবাদ থেকে উত্তর-গঠনবাদ যাত্রা সম্বন্ধে দীর্ঘ নিবন্ধও। 'নোটবই'টিকে সুসম্বন্ধ আকার দিতে কত দ্রুত কত লোকের সঙ্গে যে যোগাযোগ করেন সুধীরবাবু, স্নিগ্ধবচনে

তাড়ায়-তাড়ায় জ্বালিয়ে-হাঁপিয়ে মারেন বিদ্বজ্জনদের, তুলনা নেই সে ক্ষিপ্রতার।

'যৌনতা ও সংস্কৃতি'-র বিশেষ আকর্ষণ ছিল, বঙ্গসমাজে তখনও অপ্রবিষ্ট, রবীন্দ্রনাথের আঁকা দুটি রেখাচিত্র। বিশ্বসংসারে বহুৎ আছে পুরুষ আঁকিয়ের আত্মপ্রতিকৃতি; কিন্তু, তাই ব'লে বৃদ্ধ এক শিল্পীর স্বহস্তে রচা আশিরপা নগ্ন স্বমূর্তি? রবীন্দ্রভবনের বদ্ধ কক্ষে প'ড়ে থাকা ছবিজোড়াকে "অনাদরের অচিহ্নিত স্বাধীনতা" থেকে রক্ষা ক'রতে নগদ খেসারৎ সহ বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল সুধীরবাবুকে। ভোলা অনুচিত, তখনও আর. শিবকুমার সংকলিত *রবীন্দ্রচিত্রাবলি* (২০১১) অমুদ্রিত, তার তিনের খণ্ডে সন্নেবেশিত রবীন্দ্রনাথের রং-তুলিতে নারী-পুরুষের যে-ক-টি বিলকুল বেপর্দা চিত্রণ আছে সেগুলিও দর্শকের নয়ন-অগোচর। 'যৌনতা ও সংস্কৃতি' সংখ্যার সংকল্পই ছিল, ফ্রয়েডীয় ব্যাকরণ-মতে সুভদ্রশাসনবশে বিবিধ যৌনচাগাড়ের 'repression'/অবদমন ও তৎজনিত যা সামাজিক শুচিবাই, তার মোচন না হোক, অন্তত খানিক উন্মোচন। এরেই কয় কাব্যিক ন্যায্যতা—বাউল-আচরিত 'চারি চন্দ্রভেদ' সম্পর্কে যাঁর বিন্দুমাত্র সংকোচ ছিল না, তিনিই আবার রবীন্দ্র-অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের নিরাবরণ আলেখ্য নিয়ে এলেন খোলা আলোয়।

'দৃশ্যরূপ' সংখ্যার জন্য আলোকচিত্রে পারদর্শিনী এক গুণী সহ সুধীরবাবু ও আমি ট্যাক্সিযোগে বেরোই লম্বা সফরে। আমা হেন অসংশোধনীয় ঘরকুনোকে টেনে নিয়ে যান সুধীরবাবু সুদূর উত্তর

শিল্পী: সোমনাথ ঘোষ

কলকাতায়। লক্ষ্য ছিল: পরের ধনে পোদ্দারি করা উনিশ শতকীয় জমিদারদের অট্টালিকার পাশাপাশি ধূসর মধ্যবিত্ত আবাসন, 'Irony' নামধেয় লোহার দোকানের মতন নামবাহারি বিপণির সাইনবোর্ড, ইত্যাদি-প্রভৃতি স্থিরফটোয় গাঁথা। পাড়ি-অন্তে ফের দক্ষিণমুখো যখন আমরা, অতর্কিতে মুখ পিছলে বলে ফেলি, "যাক্ বাবা, সভ্যতায় ফেরা গেল আবার"। আমার কাছে যা ধ্রুববাক্য, তার সহসা-ফাঁসে বেজায় খুশ, তার দিক্‌বিদিক প্রচারে এ বেচারাকে জহাঁতক্ ভুগিয়েছিলেন 'ধ্রুবপদ'-এর সম্পাদক মহোদয়।

তবে, সান্ত্বনা এই যে, যা গোপন, বাতুন যা, তাকে জাহের, লোক-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করা সম্বন্ধে খোদ সুধীরবাবুর মনেই খটকা জাগে একদিন। *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*-এর ভূমিকাকার, তাঁর *বাউল-ফকির কথা*-য় (২০০১) সংশয়ান্বিত, যে "দমের কাজ" বাউলদের গুহ্য-ক্রিয়া, তা নিয়ে আজ তারাই যে "শহুরে ভদ্রলোক"দের সামনে "অনর্গলভাষী" সে কি স্বাস্থ্যকর? এ যেন তাদের যাপনকলা বিষয়ে সুধীর চক্রবর্তীর মতো বিজ্ঞ সন্ধানীদের আনুকূল্যে ঘটা এমন এক "হাওয়া বদল" যাদ্দরুন অদ্বৈত আচার্যের "তর্জ্জা প্রহেলী"র সাবধানী, "বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল", বাউলরাই ভুলে বসলে!

একবার সুধীরবাবুকে কথাচ্ছলে বলেছিলাম, ধাতধাতুতে বাংলা ভাষা আদ্যন্ত নির্লিঙ্গ। 'সে আসছে' বাক্যটি যেমন—হলেও ব্যাকরণত পূর্ণাঙ্গ, এতে যার আগমন-বার্তা বিধৃত তা জ্ঞাপকতায় অসম্পূর্ণ; কারণ, না এর সর্বনামে, না ক্রিয়ায় পরিষ্কার, আগন্তুক

নর না নারী। এবং, অন্তিম বিচারে, প্রয়োগে ইতরবিশেষ রইলেও, বাংলা বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় ইত্যাদি যত পদ, সমস্তই মূলত লিঙ্গশাসনমুক্ত। অথচ, এই যে বাংলার বৈশিষ্ট্য, স্ত্রী-পুরুষ ঘিরে অস্পষ্টতায় ইঙ্গিতবহ 'সন্ধাভাষ' বানাবার সহজাতশক্তি, সে-ব্যাপারে সাহিত্যিকদের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথই পুরো মাত্রায় সচেতন—তাঁর গানে-কবিতায় এর অজস্র উদাহরণ বিদ্যমান।

যেমন শোনা তেমনি কাজ—এরপর আসতে থাকে সুধীরবাবুর অবিরত তাগাদা, আমাকে না-কি এ-বিষয়ে ছকতে হবে প্রবন্ধ। হলও তাই। তাঁরই সংকলিত *রবীন্দ্রনাথ: বাক্‌পতি বিশ্বমনা* ২-য় খণ্ডে (২০১১) সন্নিবদ্ধ হল আমার 'বাংলার লিঙ্গপ্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ'।

ইচ্ছে ছিল, প্রবন্ধটি বাড়িয়ে *আমি-তুমি-সে ও রবীন্দ্রনাথ* নামে মোটাসোটা না হোক গোটা একখানি বই ছাপাব। বইটির 'উৎসর্গ' 'পর যাঁর যথার্থ হক, স্বত্বসামিত্বের নিঃস্বত্ব অধিকার, সেই সুধীরবাবুর নিকট থেকে অর্ঘ্যগ্রহণের সানন্দ সম্মতিও জুটে গেল। বছরখানেক আগে অব্দি নিয়মিত ফোনে জানতে চাইতেন, আর কত দেরি। হচ্ছে-হবে ব'লে কেবলই কাটিয়ে-কাটিয়ে যেতাম। *আমি-তুমি-সে ও রবীন্দ্রনাথ* এখনও অলিখিত। যদি কোনোদিন সমাপ্তও হয় ও বই, সুধীর চক্রবর্তীর কাছে তার 'উৎসর্গপত্র' বাতুনই রয়ে যাবে...

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ

রঙ্গন চক্রবর্তী

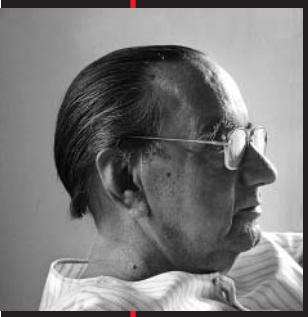

সুধীরবাবু

সুধীরবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ১৯৯৬-৯৭ সালে। আমি তখন সাসেক্সে বাংলা গান নিয়ে গবেষণা করছি। এক বছরের জন্য ফিল্ড ওয়ার্ক করব বলে কলকাতায় ফিরে এসেছি। গানের বিষয়ে জানবার জন্যে নানান মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। এই সময় আমার তখনকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর শিক্ষক বন্ধুদের মাধ্যমে সুধীরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হল। স্মৃতির অবস্থা খারাপ, ঠিক মনে নেই, 'বারোমাস'-সম্পাদক অশোক সেনেরও কোনো ভূমিকা ছিল কিনা।

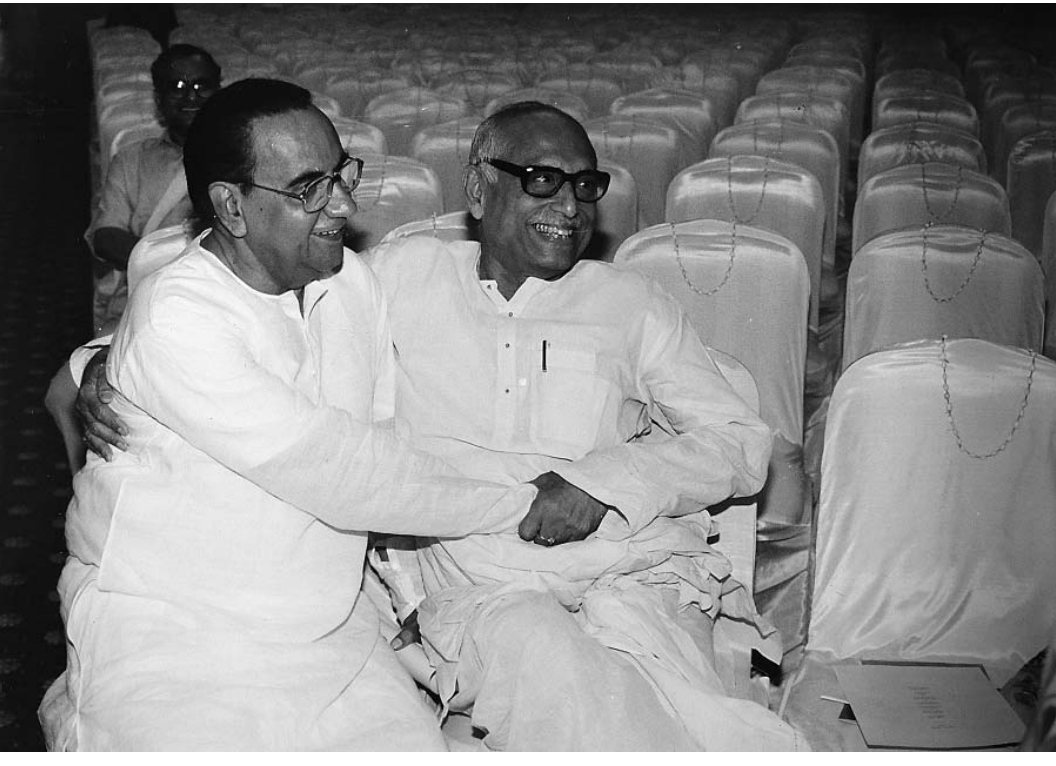

সেই যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং ২১১২ সাল নাগাদ আমি কাজের তাগিদে মুম্বাই প্রবাসী হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ছিল। সুধীরবাবুর জীবন আর কাজ ছিল বিশালভাবে ছড়ানো। তাঁর সব দিক সম্পর্কে জানা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি সেই এক বছর আর তার পরেও নানান জায়গায় তাঁর চেলা হয়ে ঘুরেছিলাম, আর অনেক কিছু শিখেছিলাম, আর এক জন আশ্চর্য মানুষকে দেখেছিলাম, তারই কয়েকটা ঘটনা বলি, তার বেশি বলার যোগ্যতা আমার নেই।

সেই সময় এবং পরেও সুধীরবাবু কলকাতায় এলে এক দুই রাত আমার কাছে থেকে যেতেন। খুব পরিপাটি মানুষ ছিলেন। রাতে ফিরে স্নান করে লুঙ্গি-ফতুয়া পরে, চুল আঁচড়ে একেবারে ফিটফাট। আর চেহারা তো ছিল চমৎকার, সব মিলিয়ে খুব ইমপ্রেসিভ। একদিন সকালে উঠে উনি বললেন, আজকে যাদবপুরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে যাব, যাবে নাকি? আমি তো এক পায়ে খাড়া। সুধীরবাবুর সঙ্গে চললাম। তো দোতলারই মনে হয়, নাকি একতলার মনে নেই, বিরাট টেবিল ঘিরে সবাই বসল, সুধীর বাবু বললেন। বলতে বলতে উনি রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের ত্রিমাত্রিকতার উদাহরণ দিতে গিয়ে হঠাৎ 'আলোর অমল কমলখানি' গানটি গেয়ে উঠলেন আর থেমে থেমে 'কে ফোটাল' ইত্যাদি অংশ গাইতে গাইতে বোঝাতে লাগলেন উনি কী বলতে চাইছেন। হঠাৎ দেখলাম আমার কেমন যেন লাগছে, আর আমার দু-চোখ দিয়ে জল পড়ছে। পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেল আজও আমি সেই গান গাওয়া ভুলতে পারিনি।

আর একবার সুধীরবাবু বর্ধমানে যাবেন, সঙ্গে আমি চললাম। সরকারি গাড়িতেই কলকাতা থেকে গেলাম কিনা মনে নেই, বর্ধমানে তো সেই মার্কামারা সাদা অ্যামবাসাডার ছিলই। যত দূর মনে আছে, সেখানে লোকসংগীতের গায়কদের কোনো এক বৃত্তির বিষয়ে কিছু একটা ছিল। গিয়ে দেখলাম, সেখানে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছেন। বেশ কিছু বর্ষীয়ান গায়ক-গায়িকা সঙ্গে তাঁদের ছেলে-মেয়ে বা নাতি-নাতনিও নিয়ে এসেছেন, তারাও গান গায়। সেখানে অনেক কিছু ঘটতে থাকল সবটাই শ্রুতিমধুর নয়। তবে আমি অবাক হয়ে দেখলাম যারা এসেছে তাদের মধ্যে বয়স্কদের সবাইকে সুধীরবাবু নামে চেনেন। এবং কী গো তোমার সেই নাতিটি কোথায় বলে আলাপ চলছে। সেখান থেকে আমরা বেশ কিছুটা দূরে এক বাউলের আখড়ায় গেলাম, খুব সম্ভবত সেই বাউলের নাম ছিল সাধন দাস বৈরাগ্য। তাঁর সাধনসঙ্গিনী ছিলেন এক জাপানি নারী, তাঁর নাম খুব সম্ভবত মই। সেখানেও দেখলাম সুধীরবাবুকে সবাই চেনে, বিশাল আড্ডা হল। এরপর সুধীরবাবুর সঙ্গে কিছু কিছু জায়গায় গিয়েছি, অনেক আড্ডা মেরেছি, তার একটা বিশেষ দিক ছিল যে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলা দেশের নানান ধরণের বাউল, ফকির, ভাওয়াইয়া, গাজন, গম্ভীরা গায়কদের উনি নামে চিনতেন, এবং অনেকের বাড়িতে থেকে গান শুনে, গান গেয়ে মিশেছেন। আমি এই রকম আরেক জন মানুষকেই কেবল দেখেছি, তাঁর নাম শুভেন্দু মাইতি। এ ছাড়া আর কাউকে জানি না।

এই যে সুধীরবাবুর মধ্যে একটা গিয়ে মিশে চেনা জানার গল্প ছিল, এটা একেবারে ওঁর ভেতরে ছিল। উনি একজন কৌতূহলী

নৃতত্ত্ববিদ। আমার বাড়িতেও অনেক ছেলেমেয়ে আসত যাদের উনি বোঝবার চেষ্টা করতেন, এই বোঝবার চেষ্টা এবং ক্ষমতা ছিল সুধীরবাবুর ট্রেড মার্ক। তাই বলে যে উনি সর্বংসহ ছিলেন তা নয়। নানান বিষয়ে ওঁর স্পষ্ট মতামত ছিল, কিন্তু অপছন্দ বলেই মিশব না, এই মনটা ছিল না, তাই অনেক রকমের কাজ করতে পেরেছেন।

ওঁর চলাফেরার মধ্যে একটা পরিব্রাজকের ভাব ছিল। আসার আগে একটা ফোন করতেন যে আমি আসব। প্রথম দিকে তো মোবাইল ছিল না, ল্যান্ড লাইনে খবর দিয়ে চলে আসতেন। কলকাতায় এ রকম ওঁর বেশ কিছু আস্তানা ছিল, ভাগ করে এসে থাকতেন, যাতে কারও ওপর চাপ না পড়ে। আমাদের কাছে অবশ্য সুধীরবাবু আসাটা একটা আনন্দের ঘটনা ছিল, কারণ কত যে শিখেছি, আর সবটাই গল্পের মধ্যে দিয়ে। কখনও সঙ্গে বিশেষ বোঁচকা দেখিনি, কিন্তু সব সময় ধোপদুরুস্ত, এটাও কিন্তু শিক্ষণীয় ছিল ওঁর কাছে। তখন যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ত অয়ন গঙ্গোপাধ্যায়। বয়সে অনেক ছোটো হলেও সে সুধীরবাবু এলেই জুটে পড়ত। আমাদের তিনজনের আড্ডা জমত। অয়নের বিশেষত্ব ছিল ও *টিনের তলোয়ার* নাটকটা আগাগোড়া মুখস্থ বলতে পারত। কতবার যে কত অংশ আমরা শুনতাম। কয়েক মাস আগে অয়নও চলে গিয়েছে।

আমি কোনো দিনই লেখক নই। বাংলায় লিটল ম্যাগাজিনে লেখার ঘরানা হল অনেক পড়াশোনা করে লেখার। আশ্চর্যভাবে আমাদের দেশে নব্বই শতাংশ কিছুই পড়েন না, আবার যাঁরা পড়েন তাঁরা নীৎশে দিয়ে শুরু করে স্পিভাক পেরিয়ে এগিয়ে

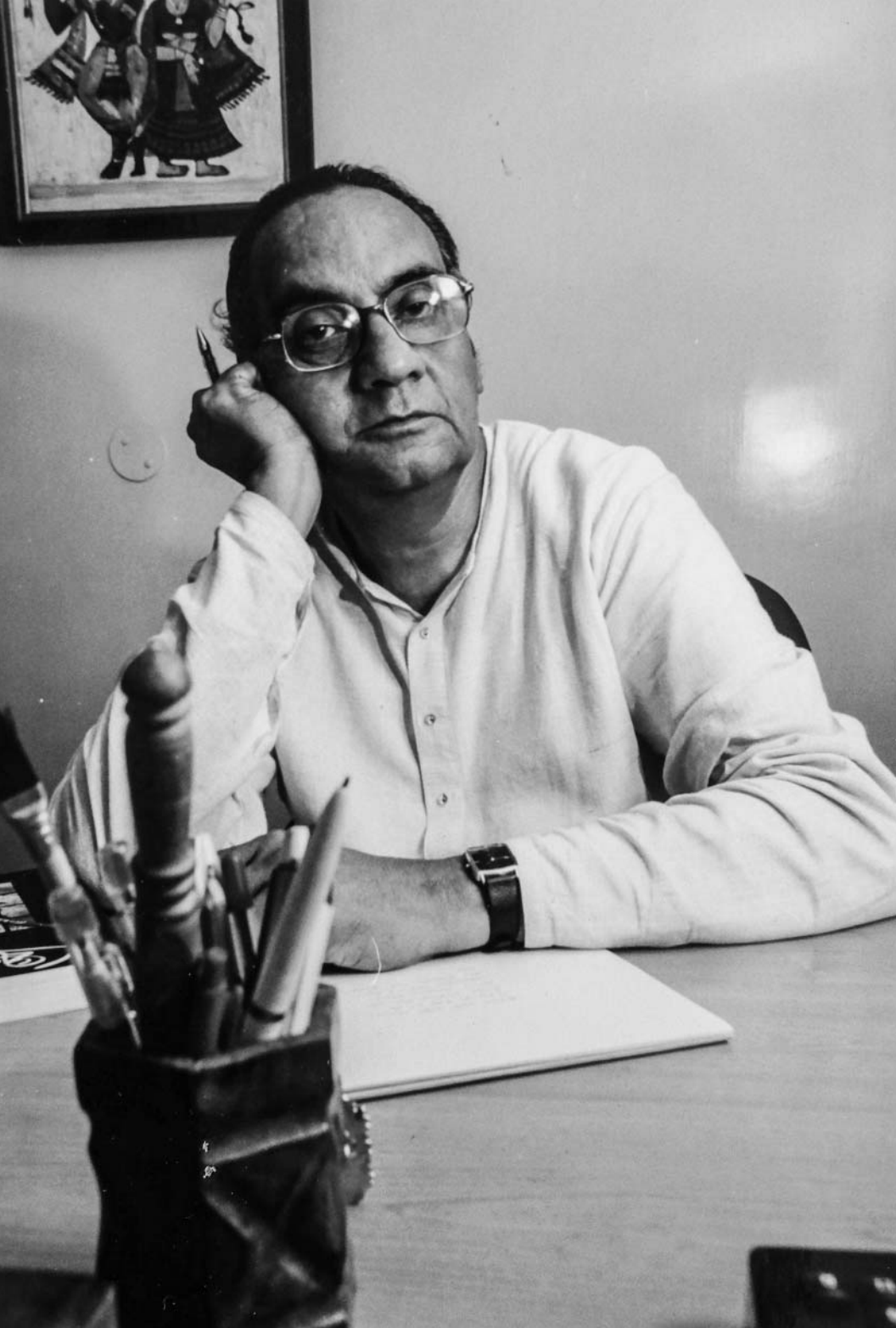

যান। কাজেই সেই বাজারে খাপ খুলতে যাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। আমাকে প্রথম লেখবার সুযোগ দিয়ে ছিলেন 'বারোমাস'-সম্পাদক, অশোক সেন। তিনি জানতেন আমার লেখা মূলত জীবন নিয়ে সাধারণ বোধের লেখা, তা-তে বড়োজোর কম পড়াশোনার কিছু ফল থাকে। কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন সেই লেখার একটা দরকার আছে, ফলে আমি বারোমাসে কয়েকবার লিখেছিলাম। আর সুধীর বাবুর লেখা বই পড়ার আগে ওঁর কিছু লেখা আমি 'বারোমাস'-এই প্রথম পড়ি।

সুধীরবাবুর মধ্যে আমি দেখি যে প্রেসিডেন্সি কলেজের এখনকার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নাম করা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সহপাঠী হওয়া সত্ত্বেও জীবন থেকে উঠে আসা বোধকে উনি খুব দাম দিতেন। বোধহয় তার সঙ্গে ওঁর লোকসংগীতে উৎসাহের একটা যোগ আছে। সুধীরবাবু যে-পত্রিকাটা সম্পাদনা করতেন, সেই 'ধ্রুবপদ'-এর সংখ্যাগুলো দেখলেই আপনারা আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারবেন। বহু সংখ্যায় এই রকম চারপাশের অভিজ্ঞতাকে বোঝার চেষ্টা আছে, পাশাপাশি আবার নতুন ধারণাগুলোর সঙ্গে সাধারণ বাঙালির পরিচয় করানোর চেষ্টা আছে, যেটা আমি পণ্ডিতদের মধ্যে খুব বেশি দেখতে পাই না। আসলে ওঁর মধ্যে একটা খোলা দরজার গল্প ছিল। আমার সেটা খুব ভালো লাগত, বেশি দেখি না তো তাই।

সুধীরবাবু সেই মানুষদের মধ্যে একজন যাঁরা প্রায় একক প্রচেষ্টায় একটা জ্ঞান বা চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করেন। আমি এ কথা বলছি না যে সুধীরবাবুর আগে বাংলা গান নিয়ে চর্চা ছিল না। কিন্তু সুধীরবাবু লালন থেকে অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ থেকে

সুমন নিয়ে বিপুল চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের গানের আলোচনার গণ্ডিকে ক্রমশ প্রসারিত করেছেন, এ কথা বোধহয় নিশ্চিত-ভাবেই বলা যায়। গত কুড়ি বছরে বাংলা গানের ওপর কী লেখা হয়েছে আমি জানি না। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আমি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া আর বেশি ধরনের গানের ওপর খুব বেশি লেখা পাইনি। আমার যত দূর ধারণা, গবেষণামূলক কাজ, বিশ্লেষণী কাজ এখনও খুব কম।

প্রথমেই বলেছি, সুধীরবাবুর মূল্যায়ন করা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমি একজন মানুষকে চিনতাম যিনি জীবন, মানুষ, গান ভালোবাসতেন এবং নিজের ভালোবাসার ক্ষমতা দিয়ে সেই ভালোবাসার জিনিসগুলোকে লালন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়।

সুশোভন অধিকারী

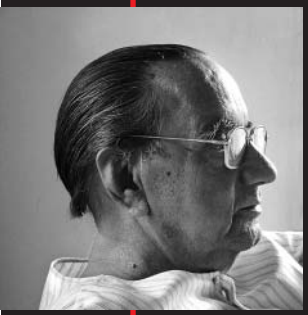

সুধীরদা

সদ্য ভর্তি হয়েছি কলাভবনে, কিছুদিন ক্লাসের পর পুজোর ছুটিতে কৃষ্ণনগর। অন্য বন্ধুরাও যে যার কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেছে। বিকেলের এক আড্ডায় বন্ধুর দিদির প্রস্তাব, এই ছুটির মাঝে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করলে কেমন হয়! সকলে প্রবল উৎসাহী, কিন্তু কোন বিষয়ে হবে অনুষ্ঠান? আর এতসব ঝক্কি সামলানো কি সহজ? তবু সব্বাই এক পায়ে খাড়া, কিছু একটা করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাসহযোগে আয়োজিত হবে শরৎবন্দনা। অতঃপর

গীতি-আলেখ্যের স্ক্রিপ্টখানাও তৈরি করে দিলেন মেসোমশায়, কলকাতার এক নামি স্কুলে তিনি বাঙলার শিক্ষক। মহড়া খানিকটা এগোলে মঞ্চসজ্জার ভার পড়ল আমার ওপর। গানের মাসিমা একদিন আমাদের বললেন, জায়গাটার পিছনদিকে দুটো বাড়ির পরে সুধীরবাবু থাকেন, উনি বাংলা সাহিত্যের নামি অধ্যাপক, খুবই সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ, অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করা উচিত। এ যাবত সুধীরবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সুযোগ হয়নি। তবে দূর থেকে তাঁকে চিনতাম। আমার দাদা কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে বাংলায় অনার্স পড়ত তার মুখেও ওঁর কথা শুনেছি। যাইহোক একদিন বিকেলে আমরা দুয়েকজন তার বাড়িতে হাজির। স্মিত হেসে দরজা খুলে ভিতরে বসতে বললেন ওঁর স্ত্রী নিবেদিতাদি। শুনেছি তিনি এখানকার মেয়েদের কলেজে বাংলার অধ্যাপিকা। সুধীরবাবু একটু পরেই এলেন। ধুতিপাঞ্জাবিতে শোভিত এক সৌম্যকান্তি বাঙালি ভদ্রলোক—প্রথম দর্শনেই মন আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তার পর তাঁকে আমার প্রশ্ন, "মঞ্চসজ্জায় শরতের আবহ ফুটিয়ে তুলতে কোন রঙের। প্রাধান্য থাকলে ভালো হয়?" একটু যেন ভেবে বললেন, 'শরৎ তো আলো, সেই আলোর রং। সকলে তা-তে সায় দিলেও আমি পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। 'আলোর রং' বলতে উনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন তা ঠাহর করতে পারছি না। এদিকে ওঁর মতো অভিজাত ব্যক্তিত্বের সামনে প্রথম আলাপে খোলসা করে কিছু বলতেও দ্বিধা হচ্ছে। অগত্যা আমার সদ্য ফিজিক্স-পড়া বুদ্ধি দিয়ে হাতড়ে চলেছি আলোর যথার্থ রং কোনটা? ক্লাশের আলোক-বিজ্ঞানের

পুঁথিতে বর্ণিত বেনীআসহকলা-র কোন রঙে শরতের আলোকে বোঝানো যাবে? অবশেষে নিজের মনেই একটা উত্তর খাড়া হল। বর্ষা যদি ছায়াঘন অন্ধকার হয় তবে মেঘ সরে যাওয়া। শরতের আলোর রং হবে সোনালি হলুদ, রুপোলি বা সাদা। সেই সঙ্গে শরতের নীল আকাশটাও মনে রাখতে হবে বৈকি। তাহলে আমাদের শারদোৎসবে মঞ্চের আবহ গড়ে তুলতে হবে এই রংগুলো দিয়ে। স্টেজ অলংকরণের প্যালেটে থাকবে সোনালি হলুদ, রুপোলি ও সাদার প্রাধান্য, তার সঙ্গে নীলের আভাস। সেটাই ঘটেছিল সেবারে। বলতে বাধা নেই, শারদোৎসবের সেই মঞ্চসজ্জা কৃষ্ণনাগরিকদের যথেষ্ট প্রশংসাও আদায় করেছিল। পিছনে তাকিয়ে মনে হয়, সেদিন তিনি স্পষ্ট করে কিছু না-বলেও একটু ইশারায় চকিতে আমার ভাবনাকে উসকে দিয়েছিলেন। পরেও এমনটা বহুবার ঘটেছে। আজ এই অসহায় সময়ের মধ্যে দিয়ে। চলতে-চলতে মনে পড়ছে, এমন কত আলোকময় মুহূর্তমালা তাঁকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে। সুধীরবাবু ছিলেন আমার দাদার শিক্ষক, 'স্যার' সম্বোধনের দূরত্বে ছিল তাঁর অবস্থান। কিন্তু কবে যে আমার কাছে তিনি সুধীরদা হয়ে উঠলেন— সেকথা আজ ভুলতে বসেছি। আমাদের মতো অর্বাচীন বালখিল্যদের প্রতি তাঁর স্নেহ আর প্রশয়ের অন্ত ছিল না। কত ছেলেমানুষী পরিকল্পনাকে প্রথমেই উড়িয়ে না-দিয়ে তার ভালোমন্দটুকু তলিয়ে বুঝিয়েছেন তার শেষ নেই। লেখক, সম্পাদক ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ সংগঠক। বড়ো কাজের মধ্যে নতুনদের ঠেলে দিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করতেন না। তার নিপুণ পরিচালনায় সেসব উদ্যোগ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার

বিপুল কাজের বিস্তার কি কেবল কয়েকটি বাক্যে শেষ করা যায়? সেদিকে তাকালে মাথা আপনিই নত হয়ে আসে, বিষাদক্লিষ্ট মন নিয়ে এখন সেদিকে যেতে চাইনা। তবে দুয়েকটা কথা বলতেই হয়। তাঁর গবেষণার এক প্রান্তে যদি লোকগান ও সংস্কৃতির জগৎ তো অন্য দিকে রবীন্দ্রসংগীতের ভুবন। পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল, দিলীপ রায়, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ—আধুনিক বাংলাগানের সবখানে এমন অনায়াস বিচরণ আর কার মধ্যেই বা দেখেছি? সুগায়কও ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের গানে যে ওজস্বিতা তার কণ্ঠে শুনেছি, আজ তা অন্যদের গলায় কেমন ম্লান ঠেকে। যে-কোনো আলোচনা সভায় তিনি শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন, শ্রোতার কাছে সে ছিল বিরল অভিজ্ঞতা। তবে আমার মনে সব ছাপিয়ে উঠছে তার রসিকতাবোধে আর পরিমিতি—এখন যার বড়ো অভাব চোখে পড়ে। সে ছিল কৃষ্ণনগরের নিজস্ব ঐতিহ্য, সম্পদ বলতেই ইচ্ছে করে—যা হয়তো শেষ হয়ে গেল তার মধ্যে দিয়ে। শব্দের মারপ্যাঁচ দিয়ে গড়া বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের যে অনাবিল নির্মলতা তার মুখ থেকে ঝরে পড়ত, তা আজ আমাদের জীবন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে। সুধীরদার ঝুলিতে যে কত বিচিত্র কাহিনি জড়ো করে রাখা ছিল তা বলে শেষ হবে না। তার সঙ্গে গল্পের আড্ডায় সময়ের কোন হুঁশ থাকত না। শেষবেলায় হঠাৎ বলে উঠতেন, "ঠিক আছে এখন আরেক বার খ্যাদানে-চা খেয়ে আড্ডা শেষ"। তার সেই উজ্জ্বল হাসিমাখা মুখ স্মরণ করে আজ নিজের মনে বলছি, আড্ডার মাঝখানে হঠাৎ সেই 'খ্যাদানে-চা' হাতে ধরিয়ে এমন অকস্মাৎ আমাদের বিদায় দিলেন কেন?

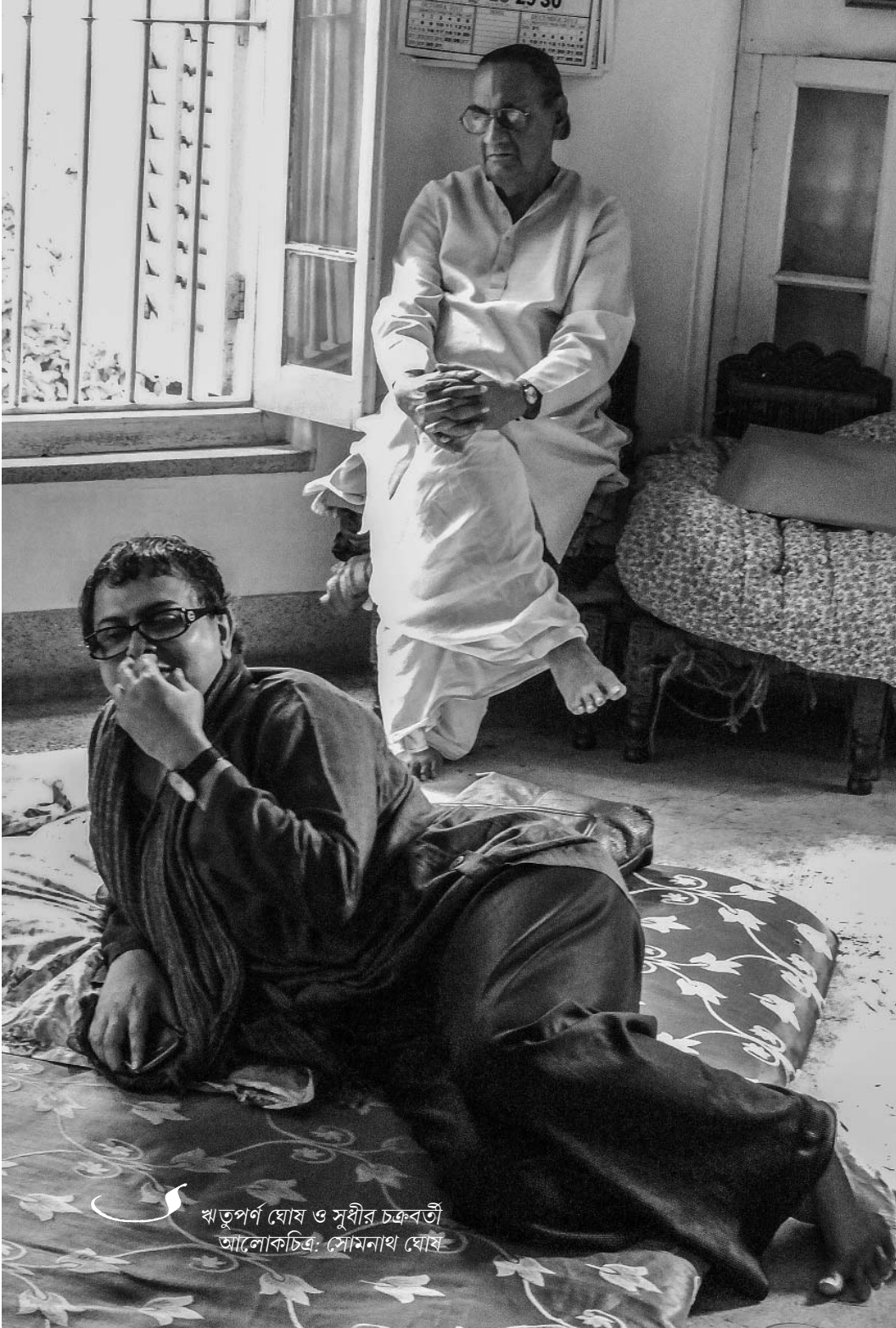

ঋতুপর্ণ ঘোষ ও সুধীর চক্রবর্তী
আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ

অশোককুমার কুণ্ডু

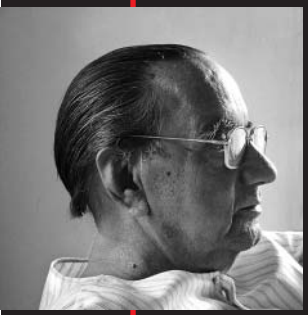

বুক দিয়ে লিখতেন

গ্রামীক বচনে এ ঘটনাকে একবাক্যে প্রকাশ: “ভালো গেছে গো, সংসার সাজিয়ে, পিছু ফিরে না-তাকিয়ে চলে গেল”।

সে তো ঠিকই। দীর্ঘ জীবন। একাধিক গ্রন্থ। অপ্রকাশিত? জানা নেই। শেষ লেখা বন্ধু, পুলু, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে, তা-ও প্রকাশিত, ০২-১২-২০২০-এর ‘দেশ’ পত্রিকায়। ফেলে রেখে যাওয়া অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি? জানা নেই। নিজের সৃষ্টিকর্মের প্রকাশ-বিকাশ,

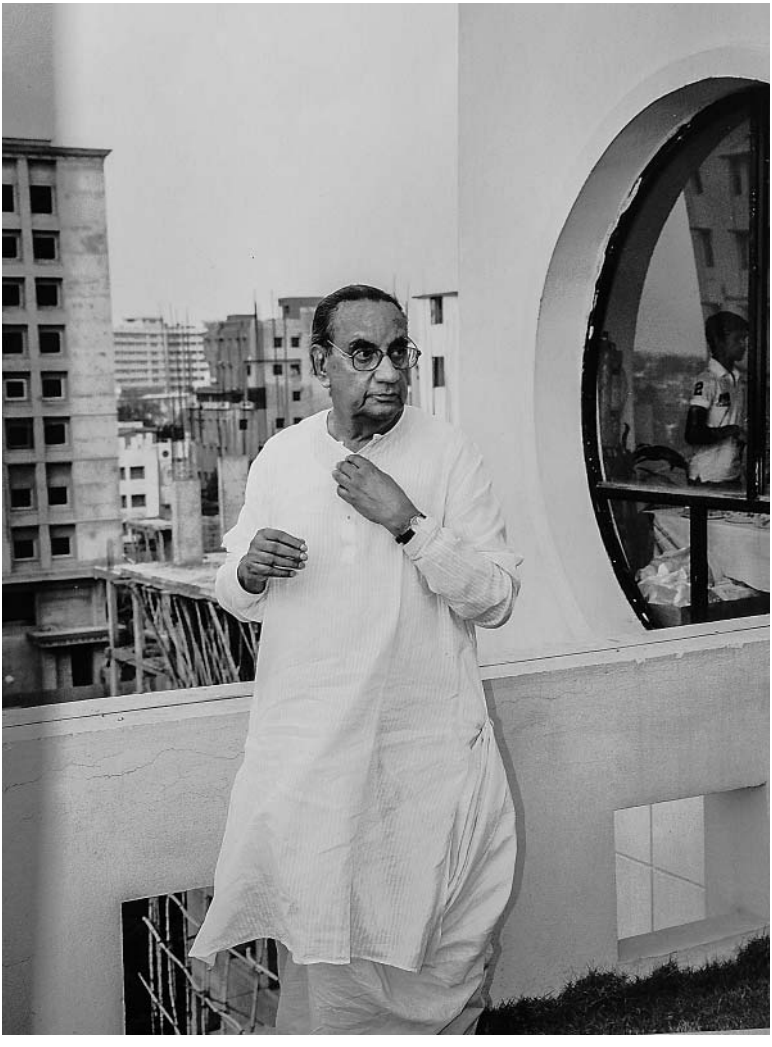

সুগ্রন্থিত। রচনাবলিও প্রকাশিত হচ্ছে। সুগ্রন্থিত করছেন কেউ কোনো প্রিয়জন। একাকী গান, হয়তো না। সংঘবদ্ধভাবেই তলে-তলে সেই দায়িত্ব নিয়েছেন নির্জনে কেউ।

পড়াশোনায় ভালো ছাত্র। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোযোগী পড়ুয়া। লেখকজীবন কিন্তু শুরু প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েসে। এবং তা কোনো বড়ো, বাণিজ্যিক কাগজে নয়। বন্ধু, সহপাঠী, সম্পাদক নির্মাল্য আচার্যের 'এক্ষণ' কাগজে। এবং প্রথম লেখাটিই নাড়া দিয়েছিল বাংলা ভাষা-সাহিত্যসেবী পাঠক এবং লেখকদের। 'গভীর নির্জন পথে'-র আলো নিওন ছিল না। ছিল পিলসুজের আলো। মমতার পরশের সঙ্গে দি্গদর্শনের। প্রবন্ধের ভাষা এমন গীতি-কবিতার মরম নিয়ে আমাদের স্মরণ করিয়েছিল, খোয়াইবুড়োর 'কাব্যে উপক্ষিতা'-র প্রবন্ধের ভাষা। যেখানে অকারণে অধ্যাপকীয় কব্জহার বাতিল।

বারে-বারে বলতেন পথের আড্ডায়, "ভাষায় জড়োয়া, ভারী গয়না দিও না। কিন্তু হীরের নাকছাবিটি দিতে ভুলো না। মাঝেমধ্যে জড়োয়া দেখাবে। কিন্তু, মূল সুর লোকায়ত রেখো। দেখো না, রূপকাশ্রিত দর্শন, লোকগানে ভার বাড়ায় না।" সে-কারণেই অধ্যাপক হয়েও সুধীরবাবুর গদ্য গীতি-কবিতাশ্রিত। একই চলনে-বলনে-ছলনে, পীরের থানে পড়ে-থাকা তিন-ঠেঙে ঘোড়ার পাশে, রাজকীয় গয়না গলায় পাঁচমুড়ার উদ্ধত ঘোড়ার গ্রীবা। লোকভাষ্যের মধ্যে হঠাৎ তৎসম শব্দের সিংহাসন। পরম বিস্ময়ের! চিন্তাহরণ চক্রবর্তী দেখে যেতে পারেননি তাঁর ছাত্রটি, এই ভাষার দড়ির খেলা বাজিগরকে।

সমস্ত বিদায়ী রুমাল, সমস্ত ভস্ম, সমস্ত 'গাড়ি ছাড়িয়া দিল', বিষাদের। তথাপি ভরা সংসার, সাফল্য, বস্তু প্রাপ্তি দু-হাত ভরে, দিয়েছে করতল ভরে মহাকাল। তথাপি, মন কেন কান্দেরে! অ-মঙ্গলের বিকেল। ফর্টিস হাসপাতাল জানে না। সুধীর চক্রবর্তী রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই কন্যা, জামাই, নাতি ও নাতনি। রেখে গেলেন অসংখ্য প্রাপ্ত বস্তু, সম্মান, সম্মানি।

তরুণদের বন্ধু ছিলেন। যে-কোনো লিটিল ম্যাগাজিন পেলে পড়তেন। দেখে নিতেন কোন তরুণ ভালো, উৎকৃষ্ট, সরেষ লেখাটি লিখেছেন। লেখার ব্যাপারে ছোটো-বড়ো-মাঝারি কাগজ মানতেন না। বলতেন, "লেখাটি সমাদরে ও যত্নের সঙ্গে মুদ্রিত হলেই হল"। আর লেখার বিষয়? সুধীর চক্রবর্তী সর্বগ্রাসী। তবে বদহজম হত না। তাঁর পাকস্থলী, মেড ইন ইনল্যান্ড। গান, সুরের কথা যখন উঠল তখন বলি, পরিশীলিত রবীন্দ্র-সজনী-রজনী-দ্বিজেন্দ্র-দিলীপ আত্মীকরণ করে ব্যান্ড বাংলা, খেউড়, কবির লড়াই, পুরাতনী এবং মার্গ সংগীত— সবই এই অধ্যাপকের চর্চার বিষয়। শ্রুতি ও লেখার চৌহদ্দির মধ্যে জিওল মাছ যেন-বা। এক্ষেত্রে এমন বলা কি অপরাধের হবে?—মিনিয়েচারে রবীন্দ্রনাথ।

অধ্যাপক, সুকথক, সুলেখক, আড্ডাবাজ ছাড়াও আর একটি মূল্যবান পরিচয়, সুসম্পাদক। তার পরিচয় 'ধ্রুবপদ'। বহুধা, বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ। লোকগবেষক, মাঠগবেষক বিশেষণ পেরিয়ে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙছেন কেষ্ণনগরের 'দৌড়বিদ' উসেইন সেন্ট লিও বোল্ট। প্রতিশ্রুতির দার্ঢ্যতা আশ্চর্যের। প্রথম সংখ্যায় 'আত্মপক্ষ' সমর্থন করেছিলেন: এক যুগ, বারোটি সংখ্যায়

শেষ হবে এই 'ধ্রুবপদ'-এর প্রকাশ। ঘটিয়েছিলেনও তাই। নিজে সম্পাদকীয় ছাড়া আর কিছুই লিখতেন না। প্রতিটি লেখার যোগ্য মানুষকে আমন্ত্রণ করতেন। এই পর্বে সাহিত্য সংগঠকের ভূমিকায় নিজেই নিজেকে নিঙড়ে অন্তিম রসের ফোঁটাটি অব্দি দিয়ে গেছেন। এই 'ধ্রুবপদ'-এই একগুচ্ছ লেখক সমাবেশের সঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী ও শিল্পী সোমনাথ ঘোষের যুগলবন্দি। যেন-বা পণ্ডিত শিবকুমারের সন্তুরের সঙ্গে জাকির হুসেনের তবলা। এমন যুগলবন্দি কখনো ঘটেনি বাংলা সাহিত্যের ছোটো কাগজের অঙ্গনে, এর আগে।

তবে এরও বহু পূর্বে আমার প্রথম দেখা ওঁকে, মুদ্রিত অক্ষরে 'শিলাদিত্য' মাসিক সাহিত্যপত্রে, যা 'ইত্যাদি প্রকাশনী' প্রকাশিত। হামচু পামু হাফ-এর মতন গোপন সভার গোপনীয়তা বজায় রেখে সুধীর চক্রবর্তী হপ্তায় দু-তিন দিন এসে সম্পাদকীয় কাজ চালাতেন, নিবরণ চক্রবর্তী নামে। নামের গোপনীয়তা! কারণ উনি, সুধীর চক্রবর্তী তখন তো সরকারি কলেজের অধ্যাপক। এ-কাজে তাঁকে টেনে এনেছিলেন তাঁরই যোগ্য ছাত্র (কৃষ্ণনগর কলেজের) শ্রীধীরেন দেবনাথ, ফাউন্ডার-এডিটর 'পরিবর্তন'। দুটি কাগজেই তরুণদের শুধু স্থান। গুরু-শিষ্য দুজনেই সম্পাদকীয় ছাড়া আর একটি বর্ণও লিখতেন না।

শিলাদিত্য কাগজেই আবুল বাশারের প্রথম এবং সাড়া জাগানো উপন্যাস 'ফুলবউ', মুদ্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন নিবারণ চক্রবর্তী ওরফে সুধীর চক্রবর্তী। তখন সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পৌঁছয় আর এক সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কাছে। তারপর ইতিহাস হয় 'ফুলবউ' এবং তার স্রষ্টা আবুল বাশার। তবে এ

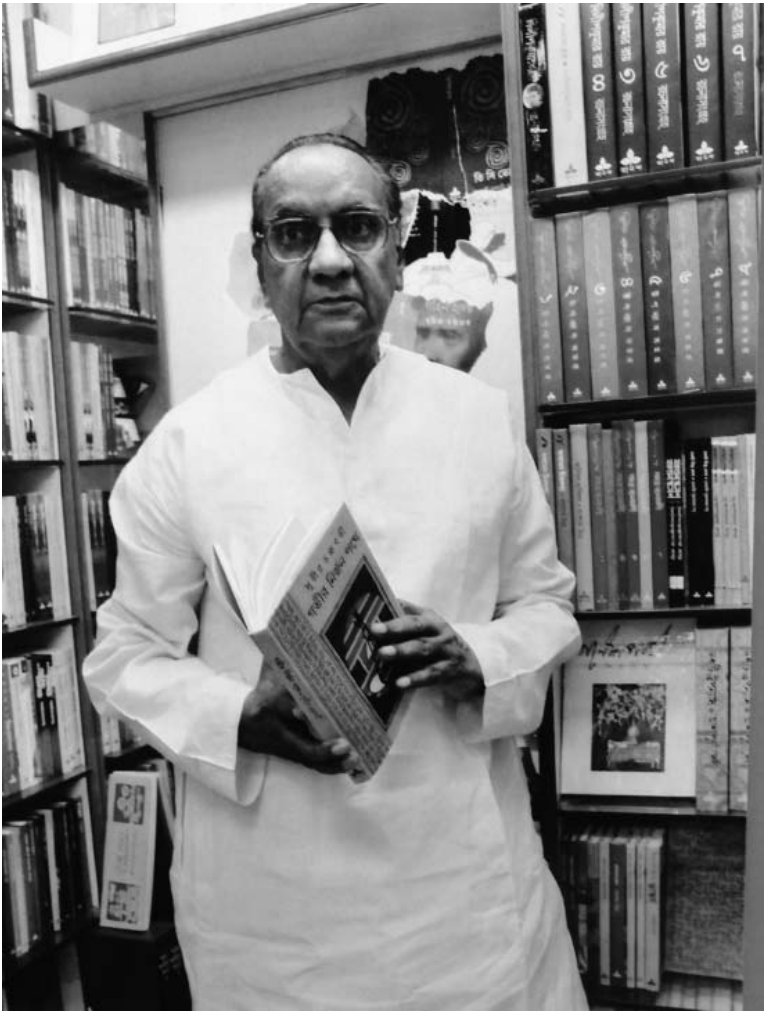

ঘটনা, ‘শিলাদিত্য’ পত্রিকায় না-ছাপার কারণ, সে আর এক অপ্রকাশিত ভিন্ন আখ্যান।

কেষ্টনগরের কৃষ্ণনাগরিকের দোতলার দরজা হাট করে খোলা থাকত, তরুণ সম্পাদক কবি গদ্য লেখকদের জন্যে। যত্ন করে তাদের সঙ্গে সঙ্গত করতেন। বলা বাহুল্য কবিরাই সংখ্যাধিক। এই ‘ব্যর্থ’ কবিদের কলম থেকে বাঁচতে হয় কেমন করে তা-ও জানতেন। একবারের ঘটনার রসমালাই পরিবেশন করেছিলেন একটি লিটিল ম্যাগের পৃষ্ঠায়। ‘ছাগল তাড়ানো চড়বড়ে বৃষ্টি’। উপস্থিত কবিদের অনুরোধ করলেন, এর পরের বার তাঁরা যেন সকলে একটি করে সনেট লিখে আনেন। তাঁদের কেউই আর তার পরে আসেননি। হয়তো তাঁরা এখনও লিখে চলেছেন সনেটটি।

অন্যরা কেউ স্বীকার করবেন কিনা জানা নেই। ‘প্রতিক্ষণ’ পাক্ষিকের দফতরে এলে পাঞ্জাবির পকেটে থাকত পাণ্ডুলিপি— অপ্রকাশিত আবুল বাশারের অপ্রকাশিত ছোটগল্প। প্রকাশ পেতে সাহায্য করতেন অনেক তরুণ কবি ও গদ্য লেখকদের। উচ্চস্বরে এ-ঋণের প্রকাশ নদিয়ার আনসারউদ্দিন, বীরভূমের তারাশঙ্করের ‘পালকপুত্র’ আদিত্য মুখোপাধ্যায়, হুগলি-আরামবাগের অশোককুমার কুণ্ডুর কণ্ঠে। সুধীরবাবুর লেখার মূল চলন, তথ্য-তত্ত্বের মিশেল, মগজ ও হৃদয়ের সমানুপাতিক ভিয়েন।

এই পথগুরুকে প্রণাম জানিয়ে কই, প্রণাম আপনার পায়ে নয় হাতে। যে-হাত পরশ দিয়েছে মধুর গদ্যের। আপনি টেবিল-চেয়ারে বসে লেখেন না। উপুড় বা আধশোয়া হয়ে লিখতেন। তাই কনুইয়ে কালো, স্পষ্ট কালসিটের দাগ। শুয়ে বা বুকে বালিশ দিয়ে লেখেন কেন? উত্তরে, রসের বাক্য: “বুক দিয়ে লিখি কিনা”।

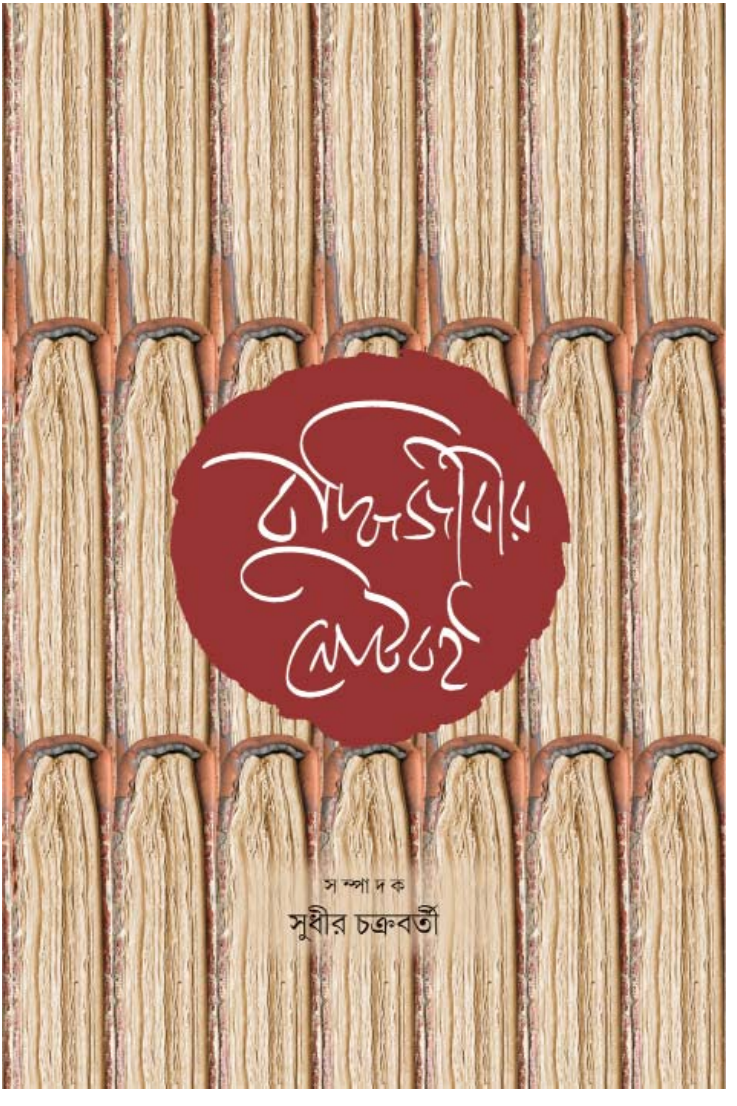

শিল্পী: সোমনাথ ঘোষ

দেবাশীষ দেব

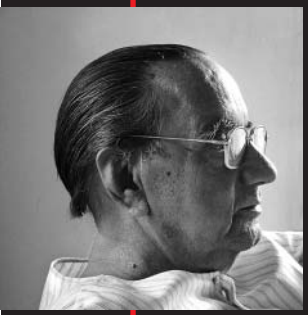

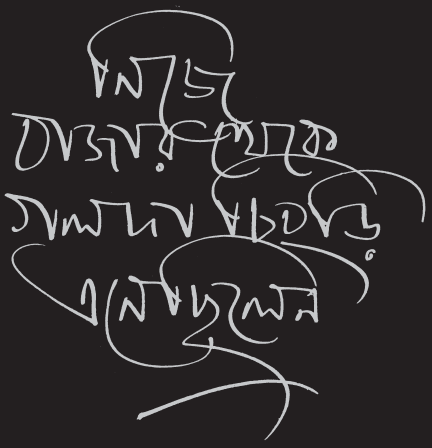

১৯৯০-এর দশকের শেষ দিক থেকে সুধীরবাবুকে চিনি। তখন উনি অধ্যাপনার পাশাপাশি প্রচুর বইপত্র লিখছেন এবং সেই সুত্রে ডিজাইন সংক্রান্ত কাজের প্রয়োজনে প্রায়ই আসতেন আমাদের 'আনন্দবাজার'-এর আর্ট ডিপার্টমেন্টে আমার পাশের টেবিলের সহকর্মী কৃষ্ণেন্দুর(চাকী) কাছে। এরই মধ্যে কোনো একসময় ওঁর লেখা সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মের গান নিয়ে লেখা বইটা পড়ে আমার মানুষটির প্রতি একইসঙ্গে বেশ কিছুটা শ্রদ্ধা আর কৌতূহল জন্মায় । ততদিনে উনি

লেখকের বাড়িতে সুধীর চক্রবর্তী, লেখক ও স্বপন সোম

‘ধ্রুবপদ’ কাগজটি বের করতে শুরু করেছেন এবং ২০০১ সাল নাগাদ ওর ‘বাউল’ সংখ্যাটির জন্য আমায় অনুরোধ জানান একটি বাউলের স্কেচ করা দেবার।এরপর আমি নানাভাবে ‘ধ্রুবপদ’-এর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি এবং কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে আঁকার পাশাপাশি ২০০৩ সালের ‘দৃশ্যরূপ’ সংখ্যায় সুধীরবাবু আমাকে দিয়ে কার্টুন সম্পর্কিত একটা বড়োসড়ো প্রবন্ধও লিখিয়ে নেন। লেখালিখির ব্যাপারে নেহাতই আনাড়ি একজনকে কীভাবে মোটিভেট করতে হয়, সাহস জোগাতে হয় সেটা প্রথমবার শিখেছিলাম ওঁর কাছে। একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে যখনই আলোচনা করতে গিয়েছি, নিরুত্তাপ গলায় বলতেন “দেখুন এটা পুরোপুরি আপনার বিষয়, যা ভালো বোঝেন লিখবেন আমি কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই জানি না”।

সম্পাদক হিসেবে বড়োছোটো সবাইকে সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনমতো দারুণ একটা টিমওয়ার্ক গড়ে তুলতেন সুধীরবাবু এবং এটাও দেখতাম অঙ্কনশিল্পের প্রতি ওঁর মনে কতখানি ভালোবাসা রয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে ফিল্ড ওয়ার্ক করার সময় উনি সবসময় চাইতেন শিল্পীরাও গিয়ে নিজেরা দেখে শুনে হাতে গরম সব কিছু স্কেচ করে নিয়ে আসুক। এই ধরনের দু-একটা আউটিং-এ ওঁর সঙ্গী হবার দুর্লভ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। তখন উনি বাংলার মেলা আর উৎসব নিয়ে একটা বড়ো কাজ করছেন যেটা বই হয়ে বেরোবার কথা, একদিন সরাসরি বলে বসলেন “আপনাকে এর প্রচ্ছদ আর ভেতরের ছবি আঁকতে হবে”। সেই সুযোগে আমিও জানালাম যে পুরোপুরি শহুরে লোক হওয়ায় গ্রামের মেলা-টেলা আমার একেবারেই

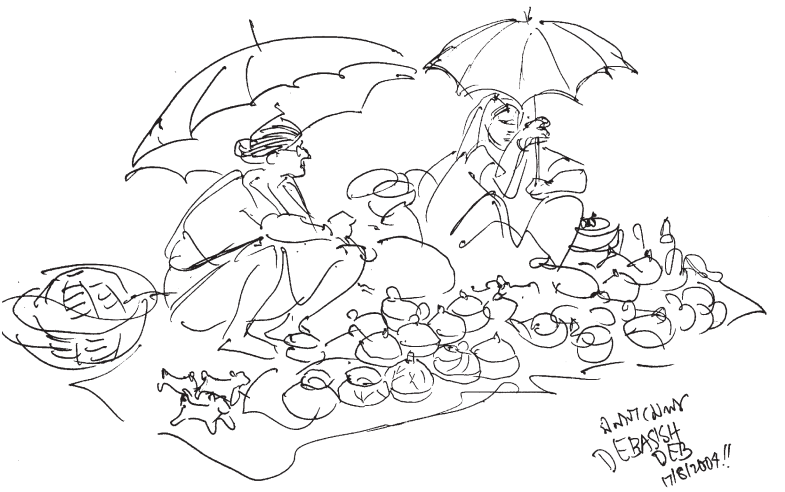

লেখককৃত মনসা মেলার স্কেচ

দেখা হয়নি। তখন শ্রাবণ মাস চলছে সুধীরবাবু তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললেন সামনেই সংক্রান্তি, ওঁর কৃষ্ণনগরের কাছেই নাকাশিপাড়ায় প্রতি বছর এই সময়ে মনসা মেলা হয়, আমাকে ওখানে ঘুরিয়ে আনবেন। তারপর রাতে ওঁর বাড়িতেই থাকব। স্টেশন থেকে গাড়িতে করে পঁচিশ মাইল রাস্তা পেরিয়ে যেখানে মেলা বসে সেই ব্রহ্মাণীতলায় নিয়ে গিয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন, পথে একবার জেনে নিয়েছিলেন আমি চিংড়ি মাছ খাই কিনা, কারণ নিজে আমার জন্য বাজার থেকে গলদা চিংড়ি এনে রাতের জন্য কালিয়া রাঁধতে বলে এসেছেন। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা চলেছিল সুধীরবাবু আর বৌদির সঙ্গে। এক ফাঁকে উঠে গিয়ে অসুস্থ বড়ো মেয়েকে শুইয়ে দিয়ে এলেন সুধীরবাবু, শুনলাম বাড়িতে থাকলে উনি এই কাজটা অন্য কারো হাতে ছাড়েন না। সেদিন বউদিকে দেখেও কম আশ্চর্য হইনি, অমন শিক্ষিত, অভিজাত একজন মানুষ অথচ কী মিষ্টি, ঘরোয়া ব্যবহার। সংসারের দায়দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে নিজের যাবতীয় শখআহ্লাদকে চিরকাল দূরে সরিয়ে রেখেছেন—এই আক্ষেপ কথায়-কথায় বেরিয়ে এসেছিল। খেতে আর খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন সুধীরবাবু। ওঁর আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে বেনেটোলা লেনের একটা বাড়ির ছাদে ম্যারাপ খাটিয়ে মাছ, মাংস, পোলাও ইত্যাদির এলাহি আয়োজন করেছিলেন। মনে আছে ওই আসরে খেতে-খেতে একজন নিমন্ত্রিতকে উনি প্রায় ধমকে উঠেছিলেন "দেখুন খাবার সময় কক্ষনো অসুখবিসুখের গপ্পো করবেন না, তার চেয়ে বরং আরও দু-পিস মাছ নিয়ে ফেলুন"। আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসে যা দেওয়া

Baul-Fakir-Dervish of Bengal

ALONG DEEP LONELY ALLEYS

SUDHIR CHAKRAVARTI

Translated from the Bengali original
Gobheer Nirjon Pothey
by UTPAL K. BANERJEE

শিল্পী: দেবাশীষ দেব

হয়েছে বেশ তৃপ্তি করে চেটেপুটে খেয়েছেন, পরে মেলা, উৎসব নিয়ে বইটির ভূমিকায় আমার গিন্নির রান্না আর আথিতেয়তার প্রশংসা করে দু-তিন লাইন লিখেওছিলেন। সেই সঙ্গে আমার আঁকা প্রচ্ছদটিও যে তাঁর পছন্দ হয়েছিল সেটাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। আপাদমস্তক মজলিশি মানুষ ছিলেন সুধীরবাবু। বহুবার বহু জায়গায় তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি, নিজে এতটুকু না-হেসে সূক্ষ্ম রসিকতায় সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন অনায়াসে। চেনাজানা লোকেদের নিয়ে যখন গপ্পোগাছা করতেন শেষ করার পর ঠিক বোঝা যেত না খোঁচা মারলেন না প্রশংসা হল। সত্যজিৎ-ঘনিষ্ঠ তাঁর বন্ধুদের পরিচালনায় 'এক্ষণ' পত্রিকার সঙ্গে গোড়া থেকেই ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত থেকেছেন সুধীরবাবু। সত্যজিত রায় নিজে ছিলেন তাঁর অন্যতম চর্চার বিষয় তা সত্ত্বেও ওই মানুষটির জীবদ্দশায় কোনোদিন রায়-বাড়ির চৌকাঠ পেরোতে পারেননি এ ব্যাপারে অবশ্য তাঁকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখেছি অনেকবার। এক কথায় গানপাগল লোক সুধীরবাবু গভীর গবেষণার পাশাপাশি একসময় নিয়মিত গান নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করতেন, রীতিমত রেওয়াজ করা গলা ছিল। ১৯৯০-এর দশকে দ্বিজেন্দ্রলাল আর রজনীকান্তকে নিয়ে এমনি এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে পাখোয়াজের সঙ্গে তাল ঠুকে ওঁর গাওয়া 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে তব জয়গাথা' আজও কানে লেগে আছে। নিয়মিত সাহিত্যচর্চার অভ্যাস না-থাকলেও প্রচ্ছদ বা ইলাস্ট্রেশন করতে গিয়ে সুধীরবাবুর নানা ধরনের লেখা আমায় পড়তে হয়েছে, জেনেছি হাটেমাঠে ঘোরা কী অদ্ভুত বোহেমিয়ান জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। এর সঙ্গে একেবারেই মেলাতে পারতাম

না সদা পরিপাটি সাজপোশাকের ওই আপাদমস্তক শৌখিন মানুষটিকে যাঁর ধুতির কোঁচাকে কখনো এতটুকু এদিক-ওদিক হতে দেখিনি।

ইদানীং সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হতই না। তবে ওঁর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা 'ধ্রুবপদ' প্রকাশনার জন্য কাজ করতে গিয়ে খবরাখবর পেতাম। ভীষণভাবে চেয়েছিলেন আমি সস্ত্রীক একবার কৃষ্ণনগরে ঘুরতে যাই। সত্যেনবাবুর ফটোগ্রাফি স্টুডিও 'আলেখ্য'র আড্ডাও আমাকে অনেকবার টেনেছে, কিন্তু শেষ অবধি আর হয়ে ওঠেনি। শেষবার কথা হয়েছে ফোনে,ওঁর সাড়া জাগানো *গভীর নির্জন পথে* বইটির ইংরেজি সংস্করণের যে-প্রচ্ছদ করেছিলাম সেটার যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। সেই আনন্দের স্মৃতিটুকু সুধীরবাবুকে নিয়ে আরও অনেক স্মৃতির মতোই জমে রইল মনের মধ্যে।

দে বা শি স মু খো পা ধ্যা য়

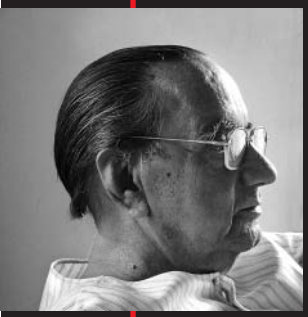

সুধীরবাবু

সুধীরবাবু, সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার ঠিক কবে আলাপ সে কথা মনে নেই। তবে কবে প্রথম ওঁর লেখা পড়ি, সেটা মনে আছে। বিশেষ করে বিষয়ের কারণেই লেখাটি কেটে রেখেছিলাম। নিবন্ধটি প্রকাশ পেয়েছিল ‘আজকাল’ কাগজের ‘সাহিত্য’ পাতায়। শিরোনাম ছিল ‘লৌকিক গানের পরিবহণ রহস্য’। কাগজের সেই কাটিংটা দেখে জানতে পারছি প্রকাশের তারিখ ১৯৮৪-র ২৮ অগস্ট। গান নিয়ে আমার তেমন কোনো বিশেষ আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না। শুনি, ভালো লাগলে আবার শুনি,

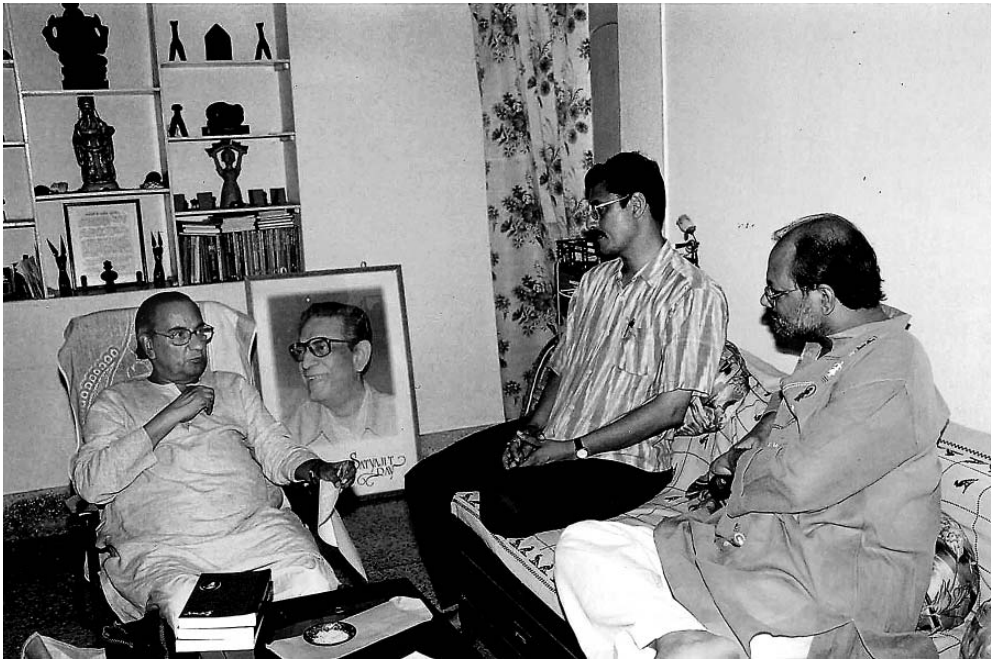

লেখকের বাড়িতে সুধীর চক্রবর্তী

খুব ভালো লাগলে ক্যাসেট বা সিডি কিনে আরও কয়েকবার শুনি। আবার নতুন গান এসে পুরোনো গানকে পেছনে পাঠিয়ে দেয়। না, রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আলাদা রকম কোনো বিশেষ ভালো লাগাও ছিল না। কিন্তু ওই একটি লেখা গান সম্বন্ধে আমার ভাবনাটাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। লেখাটার প্রথম দুটি বাক্য ছিল: "লৌকিক গানের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল গায়কদের কণ্ঠবাহিত হয়ে বেঁচে থাকা এবং নানা দেশে পরিভ্রমণ। এর ফলে অবশ্য সেসব গানের সুরের ধরন যায় পালটে, দু-চারটে শব্দ বেমালুম যায় বদলে, কখনও কখনও সম্পূর্ণ ভুঁইফোঁড় নতুন শব্দ এসে বসে।"

লেখাটিতে তিনি দেখিয়েছিলেন এইভাবে বদল হতে হতে অনেক সময় গানের মূল কথাটাই সম্পূর্ণ বদল হয়ে গানের অর্থ বদলে যায়। কুবিরের গানের বিপরীত অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে গীত হয়। গানকে কতরকমভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে এই নিবন্ধটি আমাকে তার পথ বাতলে দেয়। গানকে অন্য অর্থে ভাববার পথ খুলে দেয়। সুধীরবাবুর লেখার প্রতি আগ্রহের সেই শুরু। আমার পড়ার বিষয়ান্তর ঘটে। যখনই যা কিছু চোখে পড়ে, সুধীরবাবুর লেখা আগ্রহ নিয়ে পড়ি।

মনে আছে, সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর একদিন অফিসে একটা ফোন আসে। "আমি সুধীর চক্রবর্তী বলছি।"

'অনুষ্টুপ'-এ সত্যজিৎ রায় ও রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখবেন, সত্যজিতের ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের একটি তালিকা করে দেবার অনুরোধ করেন। আশ্চর্য হই, কই এভাবে তো কখনও কেউ ভাবেননি। আমি নিজেও কখনও এমন তালিকা করার কথা ভাবিনি। তিনি সেই লেখাটিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

দেখিয়েছিলেন সম্পূর্ণ রবীন্দ্রসংগীত নয়, টুকরো গানও কীভাবে সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন। ওই একটি তালিকা সংকলনের পর আমার ভাবনারও অনেক বিস্তার ঘটে যায়।

এরপর অবরেসবরে দেখা হয়, সামান্য কথা হয়। কলকাতায় এলে খবর দেন। বক্তৃতা থাকলে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। শুধু সঙ্গ দেওয়া নয়, একই সঙ্গে তাঁর লেখা পড়ে, কথা বলে, বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারি, আমার জীবনবোধ বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। গানের কথার অর্থ ক্রমশ সহজ হয়ে আসছে আমার কাছে। গান বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান যে শুধু শোনার নয়, পড়ারও সেটা উপলব্ধি করি। একবার রবীন্দ্রসংগীতে বিদেশি সুর প্রসঙ্গে বললেন 'জনগনমন' গানটিতে ওয়াল্টজ্ সুরে কীভাবে বাংলার কীর্তনের মিশেল ঘটে যায়। শুধু বলা নয়, গেয়ে বুঝিয়ে দিলেন মিলটা। খুব ইচ্ছে ছিল, চেষ্টাও করেছিলাম, সুধীরবাবুর রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাখ্যা আর সুর নিয়ে যদি একটা সিডি প্রকাশ করা যায়। একটি রেকর্ড কোম্পানিকে বুঝিয়ে রাজিও করিয়েছিলাম। তাঁরা যোগাযোগ করেও সিডি প্রকাশে ব্যর্থ হয়। টুকরোটাকরা অনেক স্মৃতি ভিড় করে আসে। একবার কোনো এক বক্তৃতার পর ফেরার পথে বললাম, "আপনার কথা, আপনার বক্তৃতা শুনতে এত ভালো লাগে, মনে হয় সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে যাই।'

—তা, ইচ্ছে যখন, তখন একটা ব্যবস্থা করলেই হয়।

— মানে, আমি বললে আপনি আমার বাড়িতে আসবেন?

—কেন নয়? ব্যবস্থা করো।

বাড়ি ফিরে গিন্নিকে জানালাম। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি। কিন্তু মনে হল, এমন একজন ব্যক্তির কথা, শুধু নিজের বাড়ির লোক আর আত্মীয়স্বজন শুনবে? তা হয় না। বন্ধু, গল্পকার কমল মজুমদারকে (যিনি শতদ্রু মজুমদার নামে খ্যাত) বললাম। ঠিক হল সুধীরবাবু আমার বাড়িতে এসে উঠবেন। তারপর মধ্যাহ্নভোজনান্তে কাছাকাছি একটি বড়ো ঘরে তাঁর সঙ্গে আড্ডায় বসা হবে। চন্দননগরের সাহিত্যপ্রেমী জনা কুড়ি/পঁচিশ বন্ধুকে খবর দেওয়া হল। বিকেলের জন্যে একটা টিফিনের ব্যবস্থাও হল। সুধীরবাবু দুপুর ১২টা নাগাদ সেই ঘরে এলেন। একটানা রাত প্রায় আটটা পর্যন্ত সেই আড্ডা চলেছিল। বক্তা তিনি একাই। আমরা শুধু খেই ধরাবার কাজে ছিলাম। নিজের জীবনের বিচিত্র সেই কাহিনি আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছি। শুধু চরিত্রের আনাগোনা নয়, বৈচিত্র্যময় ঘটনার অমন কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনায় জীবনের একটা সেরা দিন হয়ে রয়ে গিয়েছিল। জীবনকে কীভাবে দেখতে হয়, কীভাবে তার সামনাসামনি হতে হয়, তা জেনেছিলাম সেদিনের কথাপোকথনে। একান্তভাবেই জড়িয়ে পড়েছিলাম তাঁর সঙ্গে।

এই সুধীরপ্রেম তো শুধু আমার একার নয়, মনে আছে তাঁর ৭০ বছরের প্রাক্কালে পুস্তক বিপণি-র বন্ধুরা মিলে ঠিক করি, তাঁকে নিয়ে কিছু একটা করা দরকার। আসল কথা, আমাদের সুধীরপ্রেমের প্রকাশ অন্যদের সামনে তুলে ধরা। ঠিক করি শুধু সম্বর্ধনা নয়, একটা পুস্তিকা প্রকাশ করার ভাবনাও মাথায় আসে। পুস্তক বিপণি-র কর্ণধার অনুপকুমার মাহিন্দারের উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তায় রমাপ্রসাদ দত্ত, কুন্তল মিত্র, নারায়ণ ঘোষ

‘আজকাল’ অফিসে লেখকের সঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী

প্রমুখ সুধীরভক্তের একটা পরিকল্পনা করে ফেলি। ঠিক হয়, তাঁর বইয়ের সমালোচনাগুলি দুই মলাটে বেঁধে রাখা হবে। খুবই কম সময়ের মধ্যে তাঁর ২১টি গ্রন্থের প্রায় ৫০টি আলোচনা সংগ্রহ করে গ্রন্থভুক্ত করা গিয়েছিল। সঙ্গে তাঁর জীবনকথা, কালানুক্রমিক ও বিষয়ানুক্রমিক বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি। ২০০৪-এর ১৯ সেপ্টেম্বর, তাঁর জন্মদিনে কৃষ্ণনগরের বাড়িতে সেই গ্রন্থ *সুধীর চক্রবর্তী বই: নানামনের চোখে* তাঁর হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা সত্যিই খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। সেদিন সন্ধেবেলায় কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে সে-বইটি উদ্বোধন করেন কবি শঙ্খ ঘোষ। এবং তাঁর সত্তর বছর পূর্তি অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ২৩ ডিসেম্বর ২০০৫ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি সভাঘরে, প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সম্মাননা গ্রন্থ: *বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্রে দুই শতক*। তাঁর জন্যে কিছু করতে পেরেছিলাম, এটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো কথা।

সুধীরবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটা দৃঢ় হয় ১৯৯৬-এর পর থেকে। বাংলা পত্রিকা জগতে আবির্ভাব হয় অভূতপূর্ব একটি পত্রিকার। 'ধ্রুবপদ'। বাংলার দুই স্বল্প আলোচিত সংগীত প্রতিভাকে বিষয় করে প্রকাশ পায় পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি। মনে আছে, পত্রিকাটি নিয়ে 'আজকাল'-এ একটা ছোটো রিভিউ করি। পরের বছর বাংলার বাউল ফকির। বাঙালি পাঠকের কম-জানা বিষয়কে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয় পত্রিকাটি। 'ধ্রুবপদ' ক্রমশ বিদগ্ধ বাঙালি পাঠকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। বার্ষিক 'ধ্রুবপদ' প্রকাশ পেত কলকাতা বইমেলার সময়। পাঠক খোঁজ নিয়ে যেত কবে বেরোবে? তৃতীয় বছরের বিষয় ছিল 'বাংলা গান'। তারপর

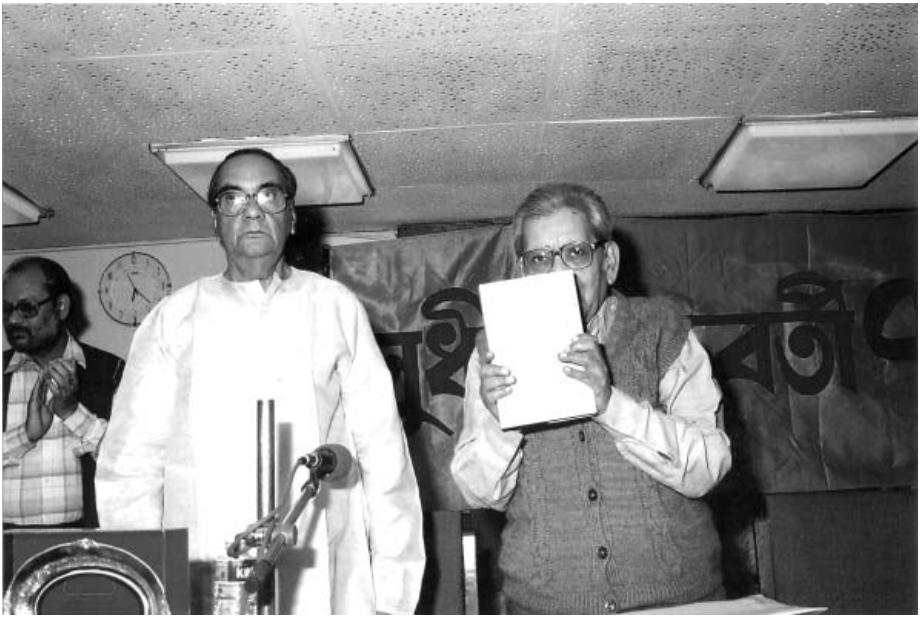

সুধীর চক্রবর্তীর সত্তর বছর পূর্তি

একে-একে প্রকাশ পেল ৯৩ জন লেখকের ১২১টি লেখা নিয়ে 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই', 'যৌনতা ও সংস্কৃতি', 'দৃশ্যরূপ', 'অভিজ্ঞতা', 'রবীন্দ্রনাথ', 'নারীবিশ্ব'। মনে আছে ২০০৫-র নভেম্বর সুধীরবাবু এসেছেন আমাদের বাড়ি। গল্পকথায় জানালাম আগামী ডিসেম্বর মাসে চন্দননগর বইমেলায় আমার আগ্রহে এবং পরিকল্পনায় হতে চলেছে 'পথের পাঁচালি'র ৫০ বছর উপলক্ষ্যে এক প্রদর্শনী। খাটের ওপর রাখা ছিল 'পথের পাঁচালী' সংক্রান্ত প্রায় ৫০টি ছবির প্রিন্ট। স্মারক গ্রন্থ এবং ছবির প্রিন্টগুলি দেখে জানালেন 'ধ্রুবপদ'র আগামী সংখ্যার বিষয় 'পথের পাঁচালী'। নির্ধারিত 'অন্যরকম বাঙালি' পিছিয়ে দেওয়া হল এক বছর। আমাকে চমকে দিয়ে জানালেন, 'পথের পাঁচালী' সংখ্যার অতিথি-সম্পাদক তুমি। তোমার কথামতন সংখ্যাটি সাজানো হবে। প্রকাশের পর যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল সংখ্যাটি। তবে দুঃখের কথা, এমনি একটি পত্রিকা ১২টি সংখ্যা প্রকাশ করে সম্পাদক ঘোষণা করেন, "এই দ্বাদশ সঙ্কলন প্রকাশ করে, একযুগ অতিক্রম করে ধ্রুবপদ সবিনয়ে আর সসম্ভ্রমে তার দপ্তর বন্ধ করল।"

একটি পত্রিকা পাঠককে কতটা উদ্বেল করতে পারে, কতটা একাত্ম হতে পারে তার সঙ্গে, এর প্রমাণ ২০০৮-এ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার পর ২০০৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি শান্তিপুরের দুই 'ধ্রুবপদ'-প্রেমী পার্থ চক্রবর্তী ও শমিত আচার্য একটি মিলন-উৎসবের আয়োজন করে। সারাদিনের সেই 'ধ্রুবপদ'-উৎসবে হাজির হয়েছিলেন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির একটি অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল

এই ‘ধ্রুবপদ’। মান বাড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের যাপনচর্চার। তেমনি এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেই দিনের মিলন মেলা। অনেকেই সেই অনুষ্ঠানে পত্রিকা এবং তাকে বিষয় করে সুধীরবাবুকে নিয়ে বলেছিলেন। প্রত্যেক বক্তার বলার আগে তাঁর সঙ্গে শ্রোতা দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী। তিনি যে সত্যিসত্যিই আমাদের আপনজন, সেদিনের অনুষ্ঠানে তা নতুন করে প্রমাণ পেয়েছিলাম। দীর্ঘ সাত দশকের বেশি সময় শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ থাকার ফলে বহুজনের শ্রদ্ধা ভালবাসা যেমন পেয়েছেন, তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আমার মতো অনেকেই তাঁকে নিকটাত্মীয় ভেবেছেন। আমাদের চলার পথে, আমাদের যাপন চর্চায় দিশারী হয়ে উঠেছেন।

দেবাশিস বসু

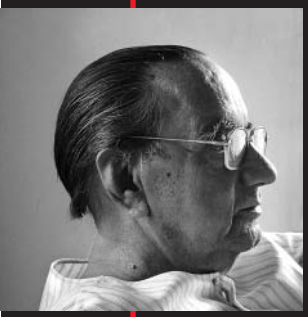

সুধীরবাবুকে আমি চিনতাম না।

সেটা বোধহয় ১৯৮৬-র মাঝামাঝি সময়। ‘এক্ষণ’-এর বার্ষিক (শারদীয়) ১৩৯৩ সংখ্যা বের করার প্রস্তুতি চলছে। সেবারে সুধীরবাবুর ‘গভীর নির্জন পথে’-র শেষ কিস্তি আর আমার ‘শহর কলকাতার পথ-নাম’-এর প্রারম্ভিক পর্ব ছাপা হওয়ার কথা।

তখন মেডিক্যাল কলেজে ডা. রণজিৎ কুমার পাঁজার অধীনে হাউসস্টাফশিপ করছি। আউটডোর শেষ হওয়ার পর কফি হাউসে হাজিরা দিতাম নির্মাল্যবাবুর কাছে।

আশুতোষ কলেজে ক্লাস না-থাকলে ওই সময়টায় নির্মাল্যবাবু কফি হাউসে বসে-বসে প্রুফ দেখতেন। লেটার-প্রেসে কম্পোজ করা লালচে কাগজের লম্বা গেইলি-প্রুফ ঝুলে পড়ত কফি হাউসের টেবিল থেকে। প্রুফ দেখায় তখন আমার প্রবল অনীহা। আমি পেন্সিল দিয়ে ভুল-ভ্রান্তির জায়গাগুলো দাগিয়ে দিতাম, তারপর প্রথাসিদ্ধভাবে সেগুলো কলম দিয়ে কাটাকুটি করতেন সম্পাদক-মশাই। পেন্সিল-পেন দুটোই থাকত তাঁর কালো রঙের কর্ডের ঝোলাতে, আমারগুলো ছোঁয়ানোর জো ছিল না। সংশোধন করতে-করতে আপন মনেই বিড়বিড় করতেন নির্মাল্য আচার্য: "প্রুফ দেখা শিখছেন না তো, যখন আপনার বই বেরোবে, তখন ঠ্যালা বুঝবেন!"

কফি হাউসের দোতলার দরজা দিয়ে ঢুকে, ডান ধারের অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের মাঝখানের কোনও একটা টেবিল দখল করতেন নির্মাল্যবাবু। পাশের জানালা দিয়ে চোখে পড়ত হিন্দু স্কুল আর সংস্কৃত কলেজ, ভরদুপুরের তেরছা রোদ ছড়িয়ে পড়ত পাশের মেঝেয়। এমনই একদিন, পৌঁছে দেখি নির্মাল্যবাবু নিবিষ্ট মনে প্রুফের সঙ্গে কপি মেলাচ্ছেন। আমার কৌতূহল কস্মিনকালে শালীনতার সীমারেখা মানেনি, সেদিন ঝুঁকে পড়ে কপিটা দেখে নিলাম। পাণ্ডুলিপিটি কিঞ্চিৎ অভিনব। সায়েন্স প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমরা যে ধরনের দড়ি-বাঁধা খাতা ব্যবহার করতাম, এ পাতা সেই গোত্রের। তার রুল-টানা অংশে কালো কালিতে মুক্তোর মতো অক্ষর সাজানো। ই-কার এবং ঈ-কারের দণ্ডের তলাটা ছিল কিছুটা ঘোরানো। মুগ্ধতা মেশানো কণ্ঠে শুধোলাম: "এটা কোন লেখা?" জবাব এল: "গভীর নির্জন পথে"।

জীবনে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ সমাপতনের সম্মুখীন হয়েছি। সেদিনও তেমনটাই ঘটল। ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত এক দীর্ঘকায় সৌম্যকান্ত ব্যক্তি কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে দাঁড়ালেন টেবিলের ধারে। মনোযোগ বিঘ্নিত হওয়ায় মুখ তুলে তাকালেন নির্মাল্যবাবু, বললেন: "বোসো, তোমারই প্রুফ দেখছি।" বুঝলাম, ইনিই সুধীর চক্রবর্তী। স্মিত ভদ্রতায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "সব ঠিক আছে তো?" বাঁকা সুরে জবাব এল: "তোমার মতো সব পিতৃতুল্য লেখক, কী আর বলব, সমস্ত ই-কার আর ঈ-কার গুলোকে প্রেস এ-কার করে দিয়েছে।" তখনও জানি না বছর পঞ্চাশের এই দুই ভদ্রলোক সহপাঠী, আর তাদের চিমটি-কাটা বচন বন্ধুসুলভ। অস্বস্তি লাগছিল, তাই মাঝে পড়ে বললাম: "হাতের লেখাটা কিন্তু অসাধারণ"। সুধীরবাবু একটু খুশি মুখে আমার দিকে তাকালেন। বক্তব্য-খণ্ডন পছন্দ হল না নির্মাল্যবাবুর, বলে উঠলেন: "আমি সব সময়েই বলি, হাতের লেখা খারাপ হলেই প্রুফ ভালো হয়। কম্পোজিটরকে কষ্ট করে পড়তে হয় তো।"

আমার সঙ্গে সুধীরবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন 'এক্ষণ'-এর সম্পাদক। একথা-ওকথার পরে দেখলাম, সুধীরবাবু কিঞ্চিৎ অস্বস্তি নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। বোঝা উচিত ছিল, তিনি একান্তে বন্ধুকে কিছু বলতে চান। বুঝলেও অবশ্য চলে যাওয়ার উপায় ছিল না, কারণ নিজের প্রুফ দেখা বা দেখানোর ফুরসত তখনও আসেনি। উসখুস করতে করতে সুধীরবাবু বলেই ফেললেন: "বলাহাড়ি ও সাহেবধনি সম্প্রদায় সম্পর্কে তো সম্প্রতি আমার দুটো বই বেরিয়েছে। নির্মাল্য, তুমি কি তোমার কাগজে ওগুলো সমালোচনা করাতে পারো না?" কাটা-কাটা

উত্তর এল: "সত্যিকারের গ্রন্থ-সমালোচনা খুব কঠিন ব্যাপার। বই দুটো সে-ই সমালোচনা করতে পারবে, যে তোমার মতো মেলায়-আখড়ায় ঘুরে ঘুরে লোকধর্মের অন্ধিসন্ধি জেনেছে আন্তরিকভাবে। তেমন লোক আমি পাব কোথায়? তার চেয়ে তোমার প্রকাশককে বলো 'এক্ষণ'-এ একটা বিজ্ঞাপন দিতে। তা-তে বিক্রি-বাটা বাড়ে কিনা, সে নিজেই দেখতে পাবে।"

কফি হাউসে অতিবাহিত করা সেদিনের সময়টুকু আমার মনে দাগ কেটে আছে, ছবির মতো ভেসে রয়েছে মানসপটে। তার কারণ তিনটি। প্রথমত, অবশ্যই সুধীরবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি হিসেবে। তাছাড়া উত্তরজীবনে দেখেছি, খারাপ হাতের লেখার সঙ্গে প্রুফের সম্পর্ক অথবা গ্রন্থ-সমালোচক খুঁজে পাওয়ার সমস্যা সম্বন্ধে নির্মাল্যবাবুর নিরীক্ষণ ছিল আক্ষরিক-ভাবে সত্যি।

সুধীরবাবু সেদিন বেশিক্ষণ বসেননি। যখন 'শহর কলকাতার পথ-নাম'-এর প্রুফ সংশোধন পর্ব চলছে, তখন বলেছিলাম: "সুধীরবাবুর ভাষাটা অসাধারণ"। কলম চালাতে-চালাতেই মুখ না-তুলে নির্মাল্যবাবুর মন্তব্য: "মহিলারা সুধীরের লেখার খুব ভক্ত, বলেন—পড়লে নাকি প্রাণ জুড়িয়ে যায়।"

পরে কোনো এক সময়ে সুধীরবাবু সহানুভূতির সুরে ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছিলেন আমার কাছে: "[নির্মাল্যরা] তখন যেখানে ভাড়া থাকত, সেখানে তেমন জায়গা ছিল না। তাই রাতে নির্মাল্য শুতে যেত হৃষীকেশ পার্কের বেঞ্চে। ওই সময়ে নির্মাল্য খুব গল্‌স্‌ওয়ার্দি পড়ত।"

কাকতালীয়ভাবে সুধীরবাবুর প্রকাশকের কাছ থেকেই ১৯৯০-এর শেষে এবং ১৯৯১-এর গোড়ায় আমার সম্পাদিত

দুটি বই বেরোয়। সেই ঘরে মাঝে-মাঝে দেখা হয়ে যেত তাঁর সঙ্গে। কর্ণধার অনুপকুমার মাহিন্দারের নিরলস পরিশ্রমে 'পুস্তক বিপণি' তখন ফুলে-ফলে বেড়ে উঠছে। খবরটা জানতে পেরে নির্মাল্যবাবু বললেন: "আপনিও ওই সুধীরের পাবলিশারের দলে ভিড়েছেন!" তারপর থেকে 'পুস্তক বিপণি'-তে যাচ্ছি শুনলেই নির্মাল্যবাবু ফুট কাটতেন: "কোথায় যাচ্ছেন, বিটপি-তে?" বারবার খোঁচা হজম করার বান্দা কোনোদিনই ছিলাম না। একদিন থাকতে না-পেরে বলে ফেললাম, "আপনি যে 'বিবর্ণব্যাঁকা'-র ঘরে বসে 'ভক্ষণ'-এর প্রুফ দেখেন, তা নিয়ে কি আমরা কিছু বলেছি!" 'সুবর্ণরেখা' ও 'এক্ষণ' নাম দুটির এহেন বিকৃতকরণে হেসে ফেললেন নির্মাল্যবাবু। "এটা কিন্তু অ্যাসপার্সান হয়ে গেল। বিটপি কথাটার মধ্যে কিন্তু সেটা নেই।" পালটা বলেছিলাম: "সুধীরবাবু বা আমি কি কাক নাকি, যে বিটপিতে গিয়ে বসব?"

ভিটেমাটি আর কুলজির বৃত্তান্ত খুঁড়ে বের করাটা আমার স্বভাবগত দোষ। একদিন 'বিপণি'-র ঘরেই কথায় কথায় প্রশ্ন পাড়লাম: "সুধীরবাবু, আপনারা কোথাকার লোক, ঢাকা না ফরিদপুর?" পালটা প্রশ্ন এল: "বোলচালে কি তেমনটা মনে হচ্ছে?" বুঝলাম, পা ফস্কেছি, এগিয়েছি ভুল পথে। কাঁচুমাচু মুখে শুধোলাম: "তবে?"

— আমরা নদিয়া জেলার লোক।

— নদিয়ার কোন দিকটা?

— শান্তিপুর আর কৃষ্ণনগরের মাঝখানে।

— গ্রামের নাম?

— দিগ্‌নগর।

— তাহলে আপনারা তো সাক্ষাৎ হটনাগর শিবের অনুচর।

এবারে এল সপ্রশংস প্রতিক্রিয়া: "বাব্বা, সেটাও জানা আছে!'

আমার সন্ধিৎসা থামল না। জিজ্ঞেস করলাম: "আপনারা কি বারেন্দ্র?" সুধীরবাবুর আহত প্রশ্ন: "গালাগালিটা না-দিলে কি চলছিল না?" আমি তো অবাক। বললাম: "কেন, মুজতবা আলি একেকটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে কেউটে সাপের গুচ্ছ বলেছেন বলে?"

— না, এটা নিয়ে একটা গল্প আছে। একবার চার ব্রাহ্মণ কোনো এক অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য রওনা হয়েছেন। প্রথম তিনজন বারেন্দ্র। তাঁদের পদবি লাহিড়ি, মৈত্র ও সান্যাল। চতুর্থজন চক্রবর্তী। তিন বারেন্দ্র নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছেন— এ ব্যাটা আমাদের শ্রেণির কিনা বোঝা যাচ্ছে না। চক্রবর্তী তো রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বৈদিক সবই হয়। এমন সময়ে পথে একটা নালা পড়ল। ধুতি গুটিয়ে লাহিড়ি এবং মৈত্র ছপছপ করে পেরিয়ে গেলেন। এবারে চক্রবর্তীর পালা। মাঝ বরাবর পৌঁছে চেঁচিয়ে উঠলেন চক্রবর্তী—উফ্, সান্যাল, সামলে এসো, এখানে খাপ্‌রা আছে, আমার পা-টা কেটে গেল। শুনে লাহিড়ি আর মৈত্রর হাসি আর ধরে না। জনান্তিকে তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন— যাক্, বোঝা গেল চক্রবর্তীটা বারেন্দ্র নয়। এত পরোপকার কীসের! আমাদের পায়েও তো খাপ্‌রা ফুটেছে, আমরা কি টুঁ-শব্দ করেছি!"

শুনে না-হেসে পারলাম না। বললাম: "বারেন্দ্ররা জানতে পারলে আপনাকে ছাড়বে না।" সুধীরবাবুর জবাব: "এ-টা আমাকে একজন বারেন্দ্র-ই শুনিয়েছিলেন। স্বয়ং লেখক নারায়ণ সান্যাল।"

‘পুস্তক বিপণি’-র ঘরে আসতেন মুদ্রাকর অরুণকুমার হেঁস ওরফে ‘মন্টুদা’। একদিন ঘরে ঢুকেই সুধীরবাবুকে দেখে কুশল বিনিময়ের সৌজন্য ব্যক্ত করলেন তিনি: “ভালো আছেন?” তারপরই অনুপদা ও আমার দিকে তাকিয়ে মন্টুদার বিবৃতি: “আমি সুধীরদাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। উনি তো অনুষ্টুপেও লেখেন, আনন্দবাজারেও লেখেন। তাহলে আমাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ওঁকে কোন বর্গে ফেলা হবে? তো সুধীরদা মুখ খারাপ করলেন।” ঝটিতি প্রতিবাদ এল চোখের পলক পড়ার আগেই: “আমি কখনও মুখ খারাপ করি না। শুধু বলেছি, তোমরা আমাকে আলু-বর্গে রেখো— শুক্তোতেও থাকি, মাংসেও থাকি। কেবল দেখো, আলু শব্দটার যেন কোনো কদর্থ না-হয়।”

সুধীরবাবুর এমন আগলহীন, শাণিত রসবোধ যখন প্রকাশ পেত, তখন কিন্তু সম্পূর্ণ অটুট থাকত তাঁর বাহ্যিক গাম্ভীর্য। কেবল ক্ষণিকের জন্য চোখের মণিতে খেলে যেত বিদ্যুতের ঝিলিক।

অনুপকুমার মাহিন্দারের দেশের বাড়ি হাওড়া-হুগলির সীমানায়, পুড়াশ-কানপুর গ্রামে। সেখান থেকে নিত্যদিন বেনিয়াটোলা লেনের দোকানে যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছিল, বাসা নিয়েছিলেন হাওড়া শহরের সন্ধ্যাবাজারের কাছে। শেষ পর্যন্ত তিনি নতুন বাড়ি করলেন রামরাজাতলা-দাশনগরে। ১৯৯৭-এ গৃহপ্রবেশের দিন নক্ষত্র-সমাবেশ ঘটেছিল, আমন্ত্রণের শিকে ছিঁড়েছিল এই ক্ষুদ্র উল্কার কপালেও। সেদিন খাটের উপর বসে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে অসংখ্য গান গেয়েছিলেন সুধীরবাবু। তাঁর এই গুণটির কথা তখনও নির্বোধ আমি জানতাম না। মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর উদাত্ত পরিবেশনে।

খাওয়াদাওয়ার পর এক সময়ে স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করলেন সুধীরবাবু, সঙ্গী তাঁর ছাত্র কুন্তল মিত্র এবং আমি। স্টেশনে কথায় কথায় জানলাম কুন্তল কোনো কলেজে যোগ দিচ্ছেন। তখন তাঁর নিতান্ত অল্প বয়স, তাই মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিলাম: "কুন্তলও অধ্যাপক হয়ে গেল!" ছাত্র-বৎসল অধ্যাপকের গায়ে লেগে গেল কথাটা: "আপনি যদি ডাক্তার হয়ে ইতিহাস-চর্চা করতে পারেন, তাহলে কুন্তল অধ্যাপনা করতে পারবে না?" আমি চোপা করতে ছাড়লাম না: "সত্যিই তো, প্রবীণ অধ্যাপক যদি এমন গান গাইতে পারেন, তবে সবই সম্ভব।" আষাঢ়ের মেঘ নামল সুধীরবাবুর মুখমণ্ডলে।

এমন উদাহরণ আরও আছে। একদিন 'পুস্তক বিপণি'-র আড্ডায় আধুনিক গান নিয়ে আলোচনা চলছে, আমি বললাম: "প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অকালে না মারা গেলে সুধীরলাল চক্রবর্তী অনেক উঠতেন।" আর এক সুধীর চক্রবর্তী বলে উঠলেন: "সুধীরলালকে কেউ মনে রাখেনি, সবাই ভুলে গেছে।" আমি ফস করে বললাম: "তাহলে আমি তাঁর ভক্ত হলাম কীভাবে?" সেদিনও সুধীরবাবুর মুখ থমথমে হয়ে গিয়েছিল।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সুধীরবাবু আমাকে যুগপৎ অপছন্দ এবং পছন্দ করতেন। অপছন্দ করতেন আমার এই ঠোঁটকাটা, তার্কিক, বেপরোয়া ভঙ্গির জন্য। পছন্দ করতেন, কেন-না *গভীর নির্জন পথে* এবং *সদর-মফস্বল* আমার প্রায় মুখস্থ ছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় বই দুটির উদ্ধৃতি আওড়াতাম। সত্যিই বই দুটি ভাষার গুণে অনবদ্য। অনুপদার সমক্ষেই একদিন লেখককে বলেছিলাম: "আমার মনে হয়, রসালো ভাষায় গুরুতর প্রসঙ্গের

অবতারণায় *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, *মহাস্থবির জাতক* এবং তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের *পলাশীর যুদ্ধ*-এর সঙ্গে *গভীর নির্জন পথে* আর *সদর-মফস্বল* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দিকচিহ্ন হয়ে থাকবে।" আপাত-প্যাঁচালো উত্তরের মধ্যে আসলে নিহিত ছিল লেখকের বিনয়:"আপনি যেখানে তুলে দিচ্ছেন, সেখান থেকে পড়ে আমার মাজা না-ভেঙে যায়!"

কত লোককে যে *সদর-মফস্বল* থেকে প্রিয়দর্শী-অনিন্দিতা-অরূপ দাস-দেবদাস ভট্টাচার্যের আখ্যান পড়ে শুনিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। দেবদাসের সঙ্গে আমার জীবনের যে আদ্যন্ত সাদৃশ্য! বাবা-মা-ভাইবোন কেউ ছিল না, দীর্ঘদিন বিয়ে-শাদি করিনি। লোকে ভাবত, আমি বোধহয় নারী-বিদ্বেষী। *সদর-মফস্বল*-এ বর্ণিত ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ, যিনি 'লাস্ট ট্রেন' হিসেবে শেষ বয়সে একটি সহধর্মিণী জোগাড় করেছিলেন, আকারে ছিলেন 'মাথায় টাক, খুব বেঁটে, বেশ কালো'। সুধীরবাবুকে বলেছিলাম: "মাঝে-মাঝেই মাথায় হাত বুলিয়ে দেখি টাক পড়ছে কিনা। নয়তো এত মিল যে, লোকে ভাববে ডাক্তার সুধাংশু করের চরিত্রটা আপনি আমাকে দেখে এঁকেছেন।" দমলেন না লেখক: "আপনি তাড়াতাড়ি লাস্ট ট্রেনটা ধরে ফেলুন।"

১৯৯৪-এর জানুয়ারি মাসে ডা. স্মরজিৎ জানার নেতৃত্বাধীন এইডস নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ দিই। আট বছর কলকাতার সব ক-টি নিষিদ্ধপল্লির চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি ছিল আমার নিয়ন্ত্রণে। নথিবদ্ধ রাখতে হত চিকিৎসার খুঁটিনাটি। তার অঙ্গ হিসেবে মেয়েদের জিজ্ঞেস করতে হত আগের দিন কত জন খদ্দেরের সঙ্গে কতবার সঙ্গম হয়েছে, তার মধ্যে ক-টি ক্ষেত্রে

উপযুক্ত সুরক্ষা সে নিয়েছে। তখন বয়স অল্প, যুবতী মেয়েদের এমন প্রশ্ন করতে প্রথমদিন চরম অস্বস্তিতে পড়লাম। 'সঙ্গম', 'সহবাস' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে দেখি, মেয়েরা ভুরু কোঁচকাচ্ছে। পরিত্রাতার ভূমিকা নিলেন এক সহকর্মী: "স্যার, জিজ্ঞেস করুন কাল কতগুলি কাস্টমার হয়েছে, আর তারা কতবার বসেছে।" চমকে উঠলাম, এ ভাষা তো আমার চেনা। *সদর-মফস্বল*-এর সত্যচরণ সাধুখাঁ যে কবুল করেছিলেন: "কত সৈরভী বাতাসী হরিমতী আর পান্নার ঘরে বসেছি।" এই অভিজ্ঞতার কথা অনুপদার কাছে গিয়ে বলতে তাঁর মুগ্ধ মূল্যায়ন: "সুধীরবাবুর লেখা একদম বাস্তব থেকে উঠে আসা।"

১৯৯৬ থেকে সুধীরবাবু সম্পাদনা করতেন 'ধ্রুবপদ' নামে একটি বার্ষিক সংকলন। ২০০১-এর পঞ্চম বার্ষিক সংকলনটির বিষয় ছিল 'যৌনতা ও সংস্কৃতি'। যৌনকর্মীদের মধ্যে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় আমাকে 'কলকাতার যৌনপল্লী' নিবন্ধটি লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন সুধীরবাবু। পরবর্তীকালে সংকলনটি গ্রন্থাকার পায়। তখন সপ্তাহে কোনোদিন আমার ছুটি থাকত না— ছ-দিন সকালে আউটডোর, পাঁচদিন বিকেলে প্র্যাকটিস, রবিবার ফুলিয়ায় চেম্বার। লেখালেখির জন্য সময় পাওয়াটাই ছিল দুষ্কর। সুধীরবাবুকে পাণ্ডুলিপি দিতে যারপরনাই ঝুলিয়েছিলাম। তাঁর তাগাদার ফোনের সম্মুখীন হয়েছিল আমার নবপরিণীতা পত্নী— সুধীরবাবুর কথায় সে তো লজ্জায় জড়োসড়ো!

১৯৯০-এ কলকাতার তথাকথিত 'ত্রিশতবার্ষিকী' পালনের জন্য কিছু গোষ্ঠী কোমর বেঁধেছিলেন, কয়েকজন লেখককে

ভূষিত করা হয়েছিল 'কলকাতা-বিশেষজ্ঞ' শিরোপায়। এই বিশেষণটির বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র আপত্তি ছিল। কেন-না, কারো পক্ষে কলকাতার সব ক-টি দিকের 'বিশেষজ্ঞ' হওয়াটা অবাস্তব ব্যাপার। যিনি কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য বোঝেন, তাঁর পক্ষে সমান পটুতায় কলকাতার নিকাশিব্যবস্থা অনুধাবন করা কি সম্ভব? প্রতিবাদে একটা সংকলনের পরিকল্পনা করেছিলাম। সেখানে ষোলোজন নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কলকাতা শহরের সেই বিশেষ দিকটি নিয়ে কলম ধরেছিলেন। যেমন, তারাপদ সাঁতরা লিখেছিলেন কলকাতার মন্দির স্থাপত্য নিয়ে, সুখময় মুখোপাধ্যায় কলকাতার প্রাক্-চার্নক গুরুত্ব প্রসঙ্গে বা অলোক রায় বিবৃত করেছিলেন তিনটি নেটিভ গির্জার বিবরণী। আমি স্বয়ং সংকলন করেছিলাম শহরের ৬০৯টি পল্লিনামের তালিকা। *কলকাতার পুরাকথা* শীর্ষক বইটি সমালোচনার জন্য সুধীরবাবুর কাছে পাঠায় 'দেশ' পত্রিকা। ১৯৯১-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় তাঁর বক্তব্য। আলোচনার আরম্ভে তিনি লেখেন: "[...] দেবাশিস বসুর সম্পাদিত 'কলকাতার পুরাকথা' সংকলনটি সম্পর্কে আমাদের অভিভব ও মুগ্ধতা অনেক বেশি। কারণ এ-সংকলন বিশেষ পরিকল্পনায় প্রণীত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে এবং এর অন্তর্ভুক্ত লেখকবৃন্দ সকলেই জীবিত, সেই অর্থে সজীব সচল অনুসন্ধানের সঙ্গে জড়িত। সম্পাদক দেবাশিস বয়সে তরুণ কিন্তু সতর্ক, অধ্যবসায়ী। নিশীথরঞ্জনের মতো তিনি প্রাজ্ঞ বা প্রখ্যাত নন, তবে কলকাতার ইতিহাসচর্চায় আধুনিকদের মধ্যে তাঁর কাজে আন্তরিকতা ও ধারাবাহিকতা আছে" (পৃ. ৬৯-৭০)। নিজের শ্লাঘা প্রকাশ এ উদ্ধৃতির

উদ্দেশ্য নয়। বছর তিরিশের এক উদীয়মান সম্পাদক, যে প্রথম গ্রন্থ সম্পাদনা করছে, তাকে এমন প্রশংসাবাক্যে আর কোনো সমালোচক উদ্বুদ্ধ করতেন কি? সুধীরবাবুর এই মন্তব্য আমাকে শুধু উৎসাহিত করেনি, সন্ত্রস্ত করেছে পাছে গুণমান থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি, হারিয়ে ফেলি এমন উচ্ছ্বসিত সাধুবাদের যোগ্যতা। তাই আজও কথাগুলি আমার সারস্বতচর্চার পাথেয় হয়ে রয়েছে।

সুধীরবাবুকে শ্রদ্ধা করি আরও একটা কারণে। যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি মহানগরীর চৌম্বক আকর্ষণ সংবরণ করেছেন, পিতৃভূমিকে তিনি পরিত্যাগ করেননি। নদিয়াকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। উষ্মা প্রকাশ করে বলতেন: "কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করা হল নদিয়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তে। তার সুফল বেশিটা ভোগ করল উত্তর চবিবশ পরগণা।" অনুপদার গৃহপ্রবেশে গিয়েছিলাম ফুলিয়ার চেম্বার কামাই করে। স্টেশনের পূর্বোক্ত আলোচনায় সে-কথা জানতে পেরে সুধীরবাবু বলেছিলেন: "নদীয়ার গ্রাম বঞ্চিত হল।"

তিনি আমার মায়ের চেয়ে বছর খানেকের ছোটো ছিলেন। তথাপি সুধীরবাবু আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। অনেকবার ভেবেছি প্রতিবাদ করব, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। অনুপদার অকালপ্রয়াণের পর, তাঁর শোকসভায় শেষ দেখা হয়েছিল, সেদিনও বলা হয়নি। আর কোনদিনই বলা হবে না।

টুকরো-টুকরো ছেঁড়া স্মৃতি জুড়ে কারো পূর্ণাঙ্গ চারিত্রিক অবয়ব চিনিয়ে দেওয়া যায় না। তবু প্রিয়জনের প্রয়াণের পরে কী-ই-বা গত্যন্তর থাকে!

বাবার শেষকৃত্য সমাধা করে বাড়ি ফেরার পর আমার একমাত্র দাদা (পিসতুতো) বলেছিলেন: "স্নেহ পাওয়ার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবারে শুধু দিয়ে যাওয়ার পালা"। যখনই পূর্ববর্তী প্রজন্মের কোনো শুভানুধ্যায়ীকে হারিয়ে ফেলি, তখনই দাদার কথাগুলো কানে বেজে ওঠে। সুধীরবাবুর প্রয়াণেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

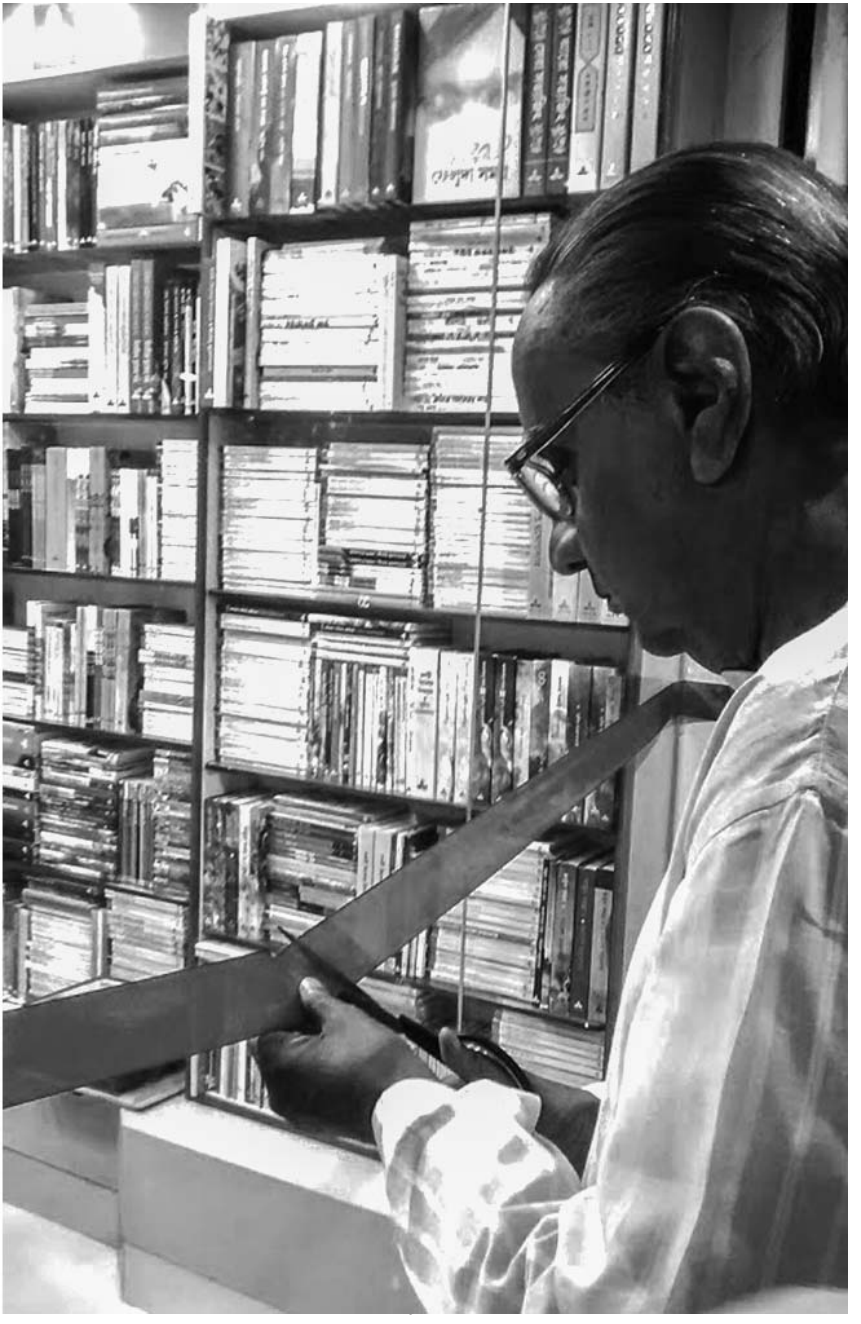

রানাঘাটে একটি পুস্তক বিপণির উদ্বোধনে *আলোকচিত্র: সৈকত মুখার্জি*

কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত

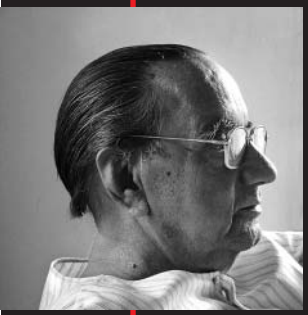

গানের ছায়ায়

সুধীর চক্রবর্তী, আমাদের স্যার চলে গেলেন। ক'দিন আগেই চলে গেছেন কবি ও শিল্পী নাসের হোসেন, চলে গেলেন কবি গৌরাঙ্গ মিত্রও। বিপুল এক শোকের পৃথিবীতে বসে চুপচাপ শ্বাস নিচ্ছি এখন। মাথার মধ্যে স্মৃতিভার। কী লিখব? এখন কী লেখা যায় কিছু?

সুধীর চক্রবর্তীর লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় বহুকালের। নব্বই দশকের মাঝামাঝি কলেজ স্ট্রিটে 'অরুণা প্রকাশনী' থেকে কিনেছিলাম বাংলা গানের

শ্রীকান্ত আচার্য ও সুধীর চক্রবর্তী

সন্ধানে' বইটি। সেই প্রথম। তারপর একে একে তাঁর প্রায় সব বই। আমাদের বাড়ির দেওয়ালের সবচেয়ে ওপরের তাকে থাকে স্যারের বইগুলি, যদিও একটি তাকে ধরে না সব। অন্যত্রও আছে কিছু।

গান, লোকশিল্পকলা সুধীরবাবুর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। আর প্রিয় সেই বিষয়ে সংপৃক্ত মানুষজন। সারাজীবন এঁদের নিয়েই কাজ করেছেন তিনি। বিপুল পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর, কিন্তু তার প্রকাশ ছিল কত সহজ, সুস্বাদু। বিষয়ের গভীর তলদেশটুকুও বোঝাতে পারতেন তিনি, যেমন লেখনীতে তেমনই কথায়।

এই লেখায় 'সুধীরবাবু' বলে লিখছি বটে আসলে তাঁকে আমি স্যার বলতাম। বেশিরভাগ মানুষেরই 'স্যার' ছিলেন তিনি। কলেজে তাঁর ক্লাস করার সৌভাগ্য হয়নি আমার, তবে তাঁর পাশে বসে কত কিছু জেনেছি শিখেছি। আর সেইসব ক্লাসের পরিসর যে কত বিচিত্র। বাড়িতে, ট্রেনে, রেল-স্টেশনে, কলেজ স্ট্রিটে, প্রেক্ষাগৃহে, প্রদর্শনীতে, আকাশবাণীতে, বইমেলায় কত জায়গায়। শেষ কয়েক বছরে আক্ষরিক অর্থেই আমি হয়ে উঠেছিলাম স্যারের ছেলে। আমি ছবি আঁকি, গান শুনি, বই পড়ি বলে খুব উৎসাহ দিতেন তিনি। লোকদেখানো উৎসাহ নয়, আমার জীবিকা-জীবন নিয়েও গভীর চিন্তা ছিল তাঁর। ছেলের জন্য বাবার যেমন থাকে। আমার জন্য কত কাজ তিনি জোগাড় করে দিয়েছেন। আমি নানারকম জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে ভালোবাসি বলে খুব আনন্দ পেতেন। বিশেষ করে গানের রেকর্ড। একবার গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নিজের বাড়িতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান করছি শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব দিলেন কৃষ্ণনগরে মিউনিসিপ্যালিটির হলে বড়ো

করে সেই অনুষ্ঠান করার। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারে কিংবা নবদ্বীপেও হল রেকর্ড নিয়ে নানারকমের কাজ স্যারেরই উদ্যোগে। যা কিছুই করতে চাইতাম সেটাকেই বড়ো করে ছড়িয়ে দেবার কথা বলতেন স্যার। আসলে প্রবাহে বিশ্বাস করতেন তিনি, গণ্ডিবদ্ধতা পছন্দ করতেন না একদম। একদিন তাঁর বক্তৃতা শেষে ফেরার পথে গাড়িতে আমি যখন মুগ্ধতা প্রকাশে ব্যস্ত, তখন আমাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন 'এবার থেকে তুমিও বলবে'। অথচ তখনও পর্যন্ত মঞ্চে বলার কথা ভাবতেও পারতাম না আমি। স্যারই আমাকে বলতে শিখিয়েছেন। আমার আঁকা ছবি ভালোবাসতেন, তিনটি প্রদর্শনীর উদ্বোধনে ছিলেন তিনি। নিউটাউন রবীন্দ্রতীর্থে 'সূত্রধর'-এর আয়োজনে গতবছরের (২০১৯) আমার একক প্রদর্শনীর সূচনায় শ্রীকান্ত আচার্যের সঙ্গে আলাপচারিতায় অনুষ্ঠানটিকে তিনি এক অসম্ভব উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। সুধীর চক্রবর্তীর গান নিয়ে লেখালিখি, বক্তৃতার কথা সবাই জানেন। কিন্তু স্যার নিজে যে কী অসামান্য গান গাইতেন সেকথা আজও অনেকে জানেন না বোধহয়। একটা সময় ছিল যখন তিনি বক্তৃতা ফাঁকে ফাঁকে গান করে বুঝিয়ে দিতেন সংগীতের অন্তর্লোক। সেই ধরনের কিছু আলোচনা আমার কাছে রেকর্ড করা আছে। আমার সংগ্রহ-প্রবণতাকে মর্যাদা দিয়ে তাঁর নিজের গলায় গাওয়া গান ও অনেক বক্তৃতার রেকর্ডিং তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। সেগুলি সব ডিজিটাইজড করে রেখেছি।

বছর তিনেক আগে একবার আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল স্যারের গানের রেকর্ডিং বাজিয়ে সেইসব গান নিয়ে আলোচনা

করব আমাদের বাড়িতে। স্যার নিজেই আলোচনা করবেন। সে-কথা বলতেই তিনি এককথায় রাজি। সেই সংগীতাসরের পরিকল্পনার কথা শুনে তুমুল আগ্রহে কলকাতা থেকে শ্রীকান্তদা ও অর্ণাদিও আমাদের বাড়িতে উপস্থিত। সে এক আশ্চর্য সম্মিলন। স্যার বসে গান নিয়ে আলোচনা করছেন, আর পায়ের নীচে বসে শ্রবণরত শ্রীকান্ত আচার্যসহ আমরা জনা চল্লিশেক মানুষ। আসর শেষ হয়ে যাবার পরে সবাই চলে গেলে আমাদের তিনতলার ঘরে আলো নিভিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডের আসর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর দুর্লভ সাক্ষাৎকার শোনা, সেইসব বিষয়ে গল্প করা, আরও কত কী। স্যারকে নিয়ে স্মৃতির শেষ নেই। আকাশবাণীর আর্কাইভে স্যারের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ধরে রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, রেডিওর প্রোগ্রাম-অফিসার সিদ্ধার্থ মাইতি স্যারকে রাজি করানোর দায়িত্ব দিয়েছেন আমার ওপর। কেন জানি না সকলের প্রত্যয়-- আমি বললে স্যার নাকি রাজি হবেনই। এই প্রত্যয়, এই ভরসা একেই কী আশীর্বাদ বলে?

স্যারকে নিয়ে লিখতে বসে কেবলই আমিত্ব চলে আসছে। কিন্তু কী করি, আমার এই আমিটাও যে অনেকটা স্যারেরই গড়া। তাঁর চিন্তায়, উদ্যমে, রুচির ছায়ায় বসে থেকেছি, কাজ করেছি। তাই মনে হয়-- আজ শ্মশানে যে দেহ বিলীন হল তিনি তো স্যার নন। স্যার হলেন তিনি, যিনি আমাদের বুকের মধ্যে রয়েছেন। স্যারের স্ত্রীকে আমি জেঠিমা বলি। মাতৃসমা এই মানুষটিকে দেখে এত কষ্ট হচ্ছে আজ। কী আশ্চর্য সুন্দর দাম্পত্য-জীবন ছিল তাঁদের। কত মরুপথতাপ সয়ে তাঁরা

লালন সাঁই কুবির গোঁসাই

আর তাঁদের ১০০ গান

সুধীর চক্রবর্তী

শিল্পী: কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত

আনন্দনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে আমাদের চিরদিনের অবাধ আশ্রয়।

এই তুচ্ছ জীবন সেই আশ্রয়েই ধন্য।

২

তাঁর কাছে যেমন ছায়া পেতে চাইতাম, ঠিক তেমনই ছায়া দিতেও জানতেন তিনি। তাঁর অর্জিত শিক্ষার মধ্যে প্রধান ছিল আত্মবিশ্বাস। নিজের যাপিত জীবন ছিল ঋজু এবং সুন্দর। গাছের মতোই হাওয়া পেলে দুলতেন, আন্দোলিতও হতেন কখনওসখনও। কিন্তু টলতেন না এতটুকু। তাঁর নিজের মনন ও বাড়ির পরিবেশের মধ্যে কোনো দ্বিচারণ ছিল না। আমি তাঁকে জাগ্রত দেখেছি, নিদ্রিতও দেখেছি। দেখেছি তাঁর কর্মমুখরতাও। লেখার জন্য টেবিল চেয়ার ছিল না তাঁর। বিছানায় বসে পেট ও বুকের মাঝামাঝি পাশবালিশ রেখে লিখতেন গভীর মগ্নতায়। কী সহজ স্বাভাবিক সেই ভঙ্গিমা। তাই কি তাঁর লেখায় এত আরামের উত্তাপ, বিছানার মতোই সুনিশ্চিত শান্তি। চা খেতে ভালোবাসতেন আর প্রিয় ছিল মিষ্টি। ডায়বেটিস তাঁকে শাসন করতে পারেনি, শর্করাকে তিনি পোষ মানিয়েছিলেন প্রায় আজীবন। গ্রাম শহর মফসসলে দীর্ঘ পথ হেঁটেছেন তিনি, কিন্তু চলায় তাঁর কোনো শশব্যস্ততা ছিল না। জীবনাচরণে বাঙালিয়ানায় ভরপুর ছিলেন। রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদীর মতোই ভালোবাসতেন সলিল চৌধুরী ও সুমনের গান। আর ভালোবাসতেন দিলীপকুমার রায়কে। আমার আঁকা দিলীপকুমার রায়ের একটি পোর্ট্রেট ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলেন, এখনও সুস্থিত সেই মুখ তাঁর বাড়িতে তিনতলা যাবার সিঁড়ির পথে দেওয়ালে।

বাউল-ফকিরের প্রতি তাঁর অদম্য টানের কথা কমবেশি সবাই জানেন। আমার আঁকা বাউলের ছাপচিত্র প্রথম দেখেছিলেন তিনি শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে। তখন তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না আমার। কিন্তু আমার নামটা মনে রেখেছিলেন। মুখোমুখি আলাপের প্রথমদিনেই বলেছিলেন সেকথা। তাঁরই অনুরোধে বাড়ির দেওয়ালে চালচিত্রের মতো করে বাইশটি বাউল-ফকির-দরবেশের ছবি এঁকে দিয়েছিলাম কোনো এক দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে। সেই চিত্রমালা আঁকার কয়েকদিনের মধ্যেই চমক। দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন খবর ফোনে খবর দিলেন সেইসব ছবি থেকে প্রাণিত হয়ে কবিতা লিখেছেন তিনি। দীর্ঘ তিনটি দশক অতিক্রম করে কবিতা লেখা। একটি, দুটি নয় প্রতিটি ছবি ধরে ধরে মোট বাইশটি কবিতা। সত্যি কথা বলতে কী, সেদিন নিজেকে অস্কারজয়ী বলে মনে হয়েছিল। চমকে উঠেছিলেন স্বয়ং শঙ্খ ঘোষও। 'সুধীরকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে ফেললে তুমি। তিরিশ, নাকি তারও বেশি বছর পর লিখল সে?' সেই বিস্ময়েই বুঝি সেইসব ছবি ও কবিতার যৌথতায় গড়ে ওঠা প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ। সে এক অলৌকিক ইতিহাস যেন। তারই ছায়ায় বসে আমার, আমাদের স্বস্তির নিশ্বাস নেওয়া। এইরকমই এক ডিসেম্বরে ফোনে খবর দিলেন তাঁর সদ্যরচিত বই 'নিভৃত মনের ছায়া' তিনি উৎসর্গ করেছেন সস্ত্রীক আমাকে। এবার অস্কার নয়, নোবেল পুরস্কার যেন।

এভাবেই ছায়ায় রেখেছিলেন তিনি। যে ছায়ায় অনেক দ্বন্দ্বের অবসান, টানাপোড়েনের জট খোলা।

স্বপনবরণ আচার্য

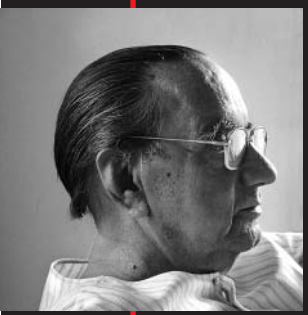

স্যার

যে একটি কারণে, অনেক শক্তির যোগফলে একটিই—যে খুব বড় কারণে স্যারের (সুধীর চক্রবর্তী) লেখাগুলো যত দিন যাবে তত বেশী পঠিত হবে বলে আমি মনে করি, তাকে স্পষ্ট করতে ছোটো একটু ভূমিকার উপর দাঁড়াতে হবে। সেটা আগে বলে নিই।

সভ্যতার সবচেয়ে স্পষ্ট বৈশিষ্ট এবং সবচেয়ে খেলো দিকটা হলো তার স্মুদ্‌নেস। 'মসৃণ' বলছি না কারণ 'মসৃণ'-এর ঋ-কার যে খড়খড়ানিটুকু দেয়, সভ্যতার আরাধ্য স্মুদনেস সেই বাধাটুকুও স্বীকার করতে রাজী নয়!

স্বীকার করবে না এবং সভ্যতার কালানুক্রমিক পথ ধরে যদি পিছিয়ে যাই (বা এগিয়ে যাই) শুদ্ধতর মানবতার দিকে তো দেখবো, মানুষ যত আদি, মানুষ তত প্রাচীন; মানুষ যত প্রাচীন, মানুষ তত বলিরেখাময় অর্থাৎ বৈশিষ্টের নিজস্ব রেখায় নিজের মতো করে বিচ্ছিন্ন; এবং মানুষ যত বিচ্ছিন্ন, মানুষ তত আত্মমগ্ন, আত্মবিশ্বাসী, এবং মনুষ্যত্বের অসীম প্রকাশের সম্ভাবনায় বিচিত্র। সভ্যতা যত এগিয়ে এসেছে (বা পিছিয়ে গিয়েছে) শতাব্দী ও মিলেনিয়াম পেরিয়ে, সে তত তার সর্বস্ব শক্তি দিয়ে এই বিশিষ্ট বিচ্ছিন্নতার বৈচিত্রকে মেশিন ও যোগাযোগব্যবস্থার 'ন্যাতা' বুলিয়ে মেরে দিয়েছে এবং হয়ে উঠেছে স্মুদ্।

আমাদের শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ একটি অংশ চিরকাল চেষ্টা করেছেন— তাঁদের জন্যই এটা আমরা বুঝতে পারি যে পৃথিবীটা হঠাৎ এই ২০২০-তে শুরু হয়নি—এই স্মুদনেসের বিরুদ্ধে গিয়ে, আমাদের 'গতকালের' দিনগুলোকে আজকের সূর্যের আলোয় এনে আমাদের বোঝাতে যে, মানুষের শুধু এই 'আছে'টাই নেই, মানুষের একটা 'ছিলো'ও আছে। সেই শিল্পীদের জন্যই পৃথিবীটার বয়স লক্ষবছর, সে শুধু এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিপ্লবে শুরু হওয়া খোকাটি নয়। স্যার এই শিল্পঘরানার একজন অতি শক্তিশালী প্রতিনিধি, তিনি মানুষের বিচিত্র পৃথকত্বের আজীবন অনুসরণকারী এবং এইজন্যই আমি মনে করি, মানুষের বিশিষ্ট জীবনের রসিক গদ্যকার হিসেবে তাঁর লেখাগুলো যত দিন যাবে তত বেশী করে আমাদের পাঠ-এর ভিতর আসবে। তথাকথিত আধুনিকের ভয়ংকর ও হাস্যকর সরলতার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর আপাতসরল গদ্যে সারাজীবন একটা জটিল, স্মিত, অথচ চূড়ান্ত

একগুঁয়ে লড়াই চালিয়ে গেছেন— আমাদের জীবন যে এককোষী প্রাণীর মতো স্মুদ্ নয়, আমাদের এই জাতীয়সড়কে বিদেশীটায়ারে হাওয়ার পেলবতায় ছোটা হেলান দেওয়া অস্তিত্বের শিকড়ে যে লক্ষবছরের মাটি আছে, সে মাটি জাতীয়সড়ক ছেড়ে নিরানব্বই শতাংশে যে নেমে যায় আঁকাবাঁকা মেঠোপথে সেই সত্যের দিকে যেখানে আমার গাড়ী যায় না বলে আমি যাই না, সেই জীবনটাই যে মানুষের বিচ্ছিন্ন শরীরে কিন্তু একতম মানবিকতায় আমার আজকের এত কায়দার অভিভাবক— সারাজীবন এই ধ্রুবসন্ধানে ও তার গদ্যধারণে মগ্ন থেকে স্যার হঠাৎ চলে গেলেন।

পঁয়ত্রিশটা বছর আমি তাঁকে দেখেছি। একথা আমার বরাবর মনে হয়েছে যে, খুব ভোরে ঘুম ভেঙে ওঠা থেকে বেশী রাত না করে ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত, শৃঙ্খলায়, সদাজাগ্রত সন্ধানে, মানবতার উপাদানসংগ্রহে যে কোনো পরিশ্রমকে হাসিমুখে হাতে তুলে নেওয়ায়, এবং গদ্যলেখায় তাকে গড়ে তুলে মানুষের চোখ খুলে দেওয়ার কাজে— তিনি আদ্যন্ত ছিলেন ইওরোপীয়। শব্দে তিনি প্রবাহিত হতেন না, শব্দ তিনি স্থাপন করতেন— পাথর বেছে, কেটে, সাজিয়ে, গেঁথে, গড়ে তুলতেন একটা একটা করে লেখা। এই গড়ে তোলার শিকড়ে তাঁর একটা মনের সন্ধান আমি পেয়েছি হঠাৎ কখনো, সেটা ভারতীয় আধ্যাত্মবোধের জোরে জোরালো, মানবতার ধর্মে সাহসী, অনুভবের যুক্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহনকারী। তাঁর আবেগে প্রকাশ প্রায় ছিলো না, আমি দেখিনি কখনো। আজ মনে হয়, আবেগটুকু তিনি মানুষখোঁজার কাজে ব্যবহার করে শেষ করতেন।

লিখতেন সেই আপাত নিরাবেগ মানুষটাই। কলম নরম হলে বর্ণ এলিয়ে যায়। তাঁর লেখার পালকনম্র অংশটুকু থাকতো কাগজ থেকে দূরে, নিব্-এর তীক্ষ্ণতায় তার প্রভাব পড়তো না। তাঁর এ' স্ব-ভাব তাঁর দৈনন্দিন জীবনেও ছিলো। অনেকে কষ্ট পেয়েছেন। এখন লেখাগুলো থাকলো প্রসাদগুনে তিনি হয়ে।

বার্ষিক সংকলন ১৯৯৬

ধ্রুবপদ

দিলীপকুমার রায় ও অমিয়নাথ সান্যাল জন্মশতবর্ষ

শিল্পী: প্রবীর সেন

রামকৃষ্ণ দে

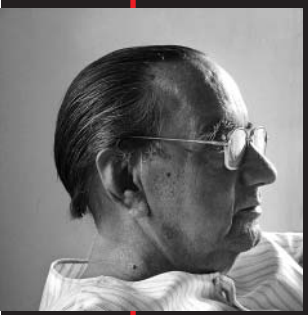

অন্তরঙ্গ স্যার চরিত্র

একদিন সন্ধেবেলা। কোনো একটা প্রয়োজনীয় কাজেই বোধহয়, স্যার আমাকে নিয়ে হাঁটছেন হাইস্ট্রিট ধরে। একটা চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি বললাম, "স্যার, এখানে ভালো কফি হয়, খাবেন?" স্যার বললেন, "মন্দ কী?" আমরা দুজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খেলাম। দোকানের বোর্ডে মূল্যতালিকায় দুধ-চা, লাল-চা, কফি ইত্যাদির সঙ্গে হরলিকস্-এর কথা আছে। স্যার বললেন, "এখানে একদিন হরলিকস্ খেলে হয়।" একটু দূরেই ধোপাপাড়ার গলি। আমার মনে হল, স্যার তাঁর

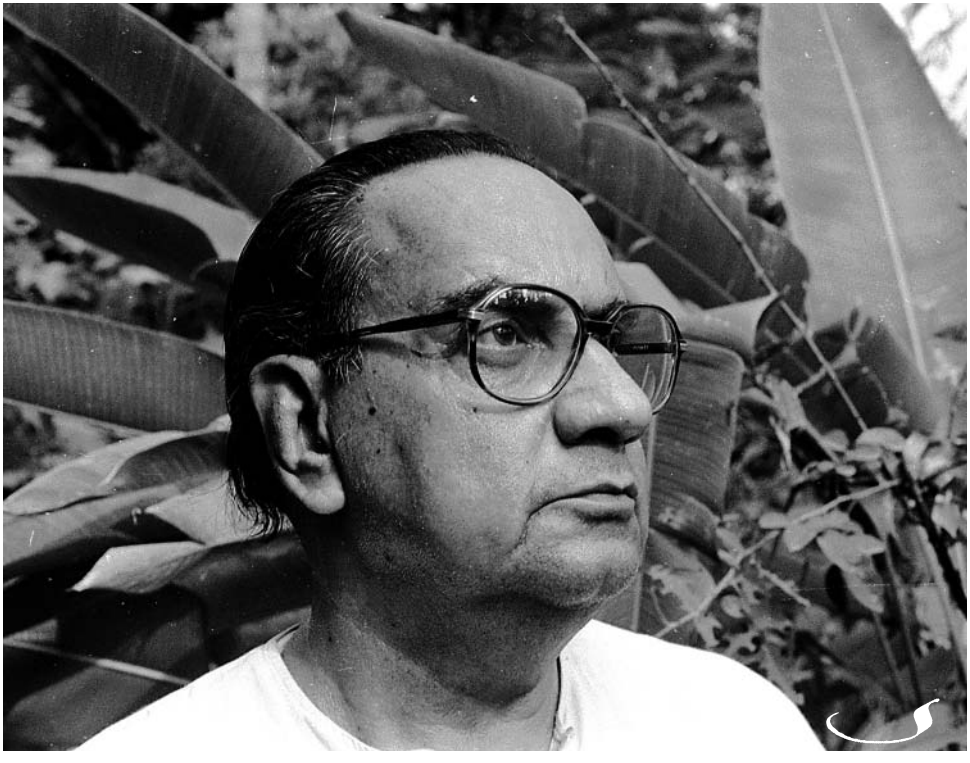

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ

শৈশবকে দেখতে পাচ্ছেন। আমার সঙ্গে স্যারের সম্পর্কটি এই রকমই। শহরের 'সম্ভ্রম-চিহ্ন' (আমার জানাশোনা মানুষদের মধ্যে প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একজনই 'সম্ভ্রম চিহ্ন' শব্দটি ব্যবহার করেছে— সে আমার অনুজপ্রতিম, কবি অম্বিকা দে— এই শব্দটিতে স্যারের অনুমোদন ছিল, বোঝা যায়। আমার বাবা লেখক, চিন্তক, বিশেষত ছাত্রবৎসল শিক্ষক প্রয়াত তারাপদ দে তাঁর জনপদের সম্ভ্রম-চিহ্ন ছিলেন, এমনটাই মনে করেছে অম্বিকা। স্যার, শ্রদ্ধেয় সুধীর চক্রবর্তীও একবার আমার বাবার শতবর্ষোত্তর স্মরণসভায় মুখ্য বক্তার ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন।) বাংলা সারস্বত সমাজে কয়েক দশক জুড়ে অনিবার্য এক আলোকিত মুখ, সাহিত্য অকাদেমি পাওয়া লেখক তাঁর অন্তঃসলিলা ছেলেমানুষিকে আমার সঙ্গে শেয়ার করে মজা পেতেন।

আসলে, স্যার আমাকে আমার কিশোরবেলা থেকে এই সত্তর পর্যন্ত দেখলেন। আমার জীবনের প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর টানা কেটেছে গ্রামে। স্যার তাঁর স্বপরিচিতিতে বারবার উল্লেখ করেছেন, তাঁর দুটি প্রধান প্রিয় বিষয় গ্রাম এবং গান। স্যার, আমাকে আমার গ্রাম-পরিবেশে যেমন নানা সময়ে দেখেছেন ঠিক তেমনই আমার গ্রামের গল্প, আমার নানা ছেলেমানুষির কথা আমার মুখে শুনে বেশ উপভোগও করেছেন।

আমার গ্রাম নদিয়ার চাপড়া ব্লকের বড়ো আন্দুলিয়া। এই গ্রামে এবং এর প্রতিবেশী একাধিক গ্রামে (নতুন গ্রাম, হাতিশালা, বৃত্তিহুদা ইত্যাদি) স্যার নানা সময়ে, নানা উপলক্ষ্যে বারবার এসেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি তাঁর সঙ্গে থেকেছি। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, স্যারের সেজদা,

আপামর কৃষ্ণনগরবাসীর কাছে যিনি 'মাস্টারমশাই' নামে সুপরিচিত সেই দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী যাঁকে তাঁর 'জীবন পথের দিশারি' বলে জানতেন সেই বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের ছিয়াত্তর বছরের জীবনের সাংগঠনিক কর্মবহুল শেষ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর কেটেছে এই বড়ো আন্দুলিয়া গ্রামে তাঁরই হাতে গড়া লোকসেবা শিবিরে। কবি-কর্মী-দেশব্রতী বিজয়লালের আহ্বানে এবং বিজয়লাল-পরবর্তী সময়েও অনেকবারই স্যার এই প্রতিষ্ঠানে এসেছেন বক্তৃতা করতে। বেশ মনে পড়ে, চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে একবার শিবিরের রিফ্রেসার্স কোর্সের বড়ো হলঘরে স্যার সংগীত সহযোগে আলোচনা করলেন 'রবীন্দ্রসংগীতে লোকসংগীতের প্রভাব' বিষয়ে। তাঁর উদাত্ত গলায় গাইলেন উদাহরণ পাশাপাশি রেখে সম্পর্কিত লোকগান ও রবীন্দ্রগান। প্রকৃত অর্থেই মন্ত্রমুগ্ধ গোটা অনুষ্ঠানকক্ষ।

আরকটি অনুষ্ঠানের স্মৃতি আজও তীব্রভাবে উজ্জ্বল আমার মনে। সেবার স্যার 'রবীন্দ্রনাথের দেয়া-নেয়ার গান' প্রসঙ্গ আলোচনা করলেন প্রাসঙ্গিক অনেকগুলি রবীন্দ্রসংগীত তাঁর জলদমন্দ্র কণ্ঠে, মরমি উচ্চারণে গেয়ে গেয়ে। অন্যান্যদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি বিজয়লালের পরিবারের সদস্যরাও। সেসময় নিবেদিতা বৌদিও আমাদের গ্রামে এসেছিলেন। স্যার দ্বিপ্রাহরিক আহারপর্বটি সেরেছিলেন আমার গ্রামের বাড়িতে। স্যার সস্ত্রীক আমাদের বাড়িতে— গোটা পরিবার এমনকি প্রতিবেশীরাও যেন খুশিতে ঝলমলে। আমার মায়ের রান্না সেদিন স্যার ও বৌদি খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিলেন।

‘রবীন্দ্রনাথের দেয়া-নেয়ার গান’— যতদূর মনে পড়ে, এই শিরোনামে, ‘দেশ’ পত্রিকায় স্যারের এই আলোচনা বড়ো আন্দুলিয়ার অনুষ্ঠানের কিছুকাল পর প্রকাশ পেয়েছিল প্রবন্ধাকারে। আমরা বড়ো আন্দুলিয়াবাসী স্যারের অনুরাগীরা এই ঘটনায় এক বাড়তি গৌরব বোধ করেছিলাম। ‘দেশ’ পত্রিকার বিরাট সংখ্যক পাঠকসমাজের পড়ার আগেই কিনা লেখকের কণ্ঠে শুনে ফেলেছি আমরা সেই অসামান্য লেখাটি। ‘দেশ’-এর বৃহত্তর সেই পাঠককুলের তুলনায় আমরা অবশ্য বেশি সৌভাগ্যবান এই কারণে যে, রচনায় উদ্ধৃত গানগুলিও আমরা শুনেছিলাম পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের আগের সুধীর চক্রবর্তীর অসাধারণ পরিবেশনায়। সেদিনের অনেকগুলি গানের মধ্যে একটি গান আজও যেন কানে বাজে:

আমি তারে শুধাই যবে ‘কী তোমারে দিব আনি’—
সে শুধু কয়, ‘আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।’
দিই যদি তো কী দাম দেবে যায় বেলা সেই ভাব্‌না ভেবে
ফিরে এসে দেখি ধুলায় বাঁশিটি তার গেছে ফেলে॥

(‘দূর দেশী সেই রাখাল ছেলে ...’)

সেই অনুষ্ঠানের পর এতগুলো বছর কাটল, কত কণ্ঠেই-না এ গান শুনেছি। কিন্তু আজ, এক শারদসন্ধ্যায় সুন্দর প্রাকৃতিকতার মধ্যে শিবির নার্সারি হলে স্যারের সেদিনের গাওয়া গানের মতো করে এই গান আর কখনও শোনা হল না।

স্যারের গানের কথাই যখন হচ্ছে, তখন আর একটি দিনের সাংগীতিক মুহূর্তের কথা না-বললেই নয়। সালটা ১৯৭২। সময়টা যতদূর সম্ভব, এপ্রিল কিংবা মে মাস। আমরা এপার

বাংলা থেকে গান্ধী জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, নদিয়া শাখার পক্ষ থেকে একটি সাংস্কৃতিক দল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে গেছি সরকারিভাবে আমন্ত্রিত হয়ে। সে-দলের মধ্যমণি কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্যদের সঙ্গে দলে ছিলেন অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী। পরপর দু-দিন মেহেরপুর এবং কুষ্টিয়া শহরে আমাদের তরফে দুটি অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়েছিল। মেহেরপুরের অনুষ্ঠানে স্যার গাইলেন 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর ...'। যখন তিনি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন 'স্বরতরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম পূর্ব-পশ্চিম বন্ধুসঙ্গম ...' তখন সভায় উপস্থিত নতুন রাষ্ট্রের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ বিশেষত তরুণ কবি ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে তীব্র আবেগের যে অভিব্যক্তি তা ভোলবার নয়। স্যার তখন ৩৮।

স্যারের এই আটত্রিশ থেকে ছিয়াশি— প্রায় ছেচল্লিশ বছর তিনি নানা সময়ে আমাকে তাঁর কাছে ডেকেছেন। হাতেকলমে শিখিয়েছেন পাণ্ডুলিপি তৈরি, অনুলিখন, শ্রুতিলিখন, প্রুফরিডিং, প্রকাশনা-প্রস্তুতির নানা খুঁটিনাটি।

তাঁর গবেষণা পর্বে এবং প্রথম দিকের কয়েকটি পুস্তক প্রণয়নের কাজে, প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সামান্য সাহায্যে আসতে পেরে আমি নিজেকে পুরস্কৃত মনে করেছি। ১৯৮৫ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত প্রকাশিত অনেক গ্রন্থ ও আখ্যান-নিবন্ধে কখনও ভূমিকা বা 'আত্মপক্ষ' অংশে কখনও রচনার নীচে আমার নাম উল্লেখিত হওয়ায় এক পরম প্রাপ্তির গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করেছি। স্যারের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার এই দীর্ঘ সময়ে শুধুই তো নিলাম, শুধুই তো পেলাম তাঁর কাছ

থেকে। অজস্র তাঁর দানে আমি ঋদ্ধ, তাঁর স্নেহ-সম্পদে আমি ধনী। ২০১১-তে কারিগর থেকে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত একটি অসামান্য গ্রন্থ *বাংলা গান: অদীন ভুবন* স্যার আমাকে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গপত্রে মুদ্রিত শব্দগুলি এই রকম: "কবিতা আর গানের ভেলায় টালমাটাল শ্রীরামকৃষ্ণ দে, স্নেহভাজননেষু"। অন্যান্য অনেক সাধারণ দিনের মতোই তিনি সেদিন আমায় ফোনে ডাকলেন: "রামকৃষ্ণ, বিকেলের দিকে একবার আসতে পারবে?" গেলাম। শরতের এক সন্ধ্যা। তখনও জানি না আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমার ভিতরে ভূমিকম্প-জাগানো সেই ঘটনা। সদ্য কলকাতা থেকে আসা বইটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "খুলে দেখো"। দেখি বইটির উৎসর্গপত্রে মুদ্রিত অংশ 'শ্রী রামকৃষ্ণ দে, স্নেহভাজনেষু'-র নীচে নীল কালিতে স্বাক্ষর 'সুধীর চক্রবর্তী, দেবীপক্ষ ১৪১৮'। আমার ঘোর কাটতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল। স্যারের পাশে বসে বৌদি আমার সেই অপ্রতিভ অবস্থা বেশ উপভোগ করছেন। আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারটি পেয়ে স্মরণীয় সেই দেবীপক্ষের সন্ধ্যায় পূজনীয় অধ্যাপক-দম্পতিকে আমি প্রণাম করলাম পা-ছুঁয়ে।

আরও কয়েকটি স্মরণীয় প্রাপ্তির কথা এখানেই উল্লেখ করি, কালানুক্রমে না-মেনেই। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের একদা-আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাব্যগ্রন্থ *সবহারাদের গান*-এর একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয় কৃষ্ণনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার। পাঠাগার-সম্পাদক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা আর প্রবল উৎসাহে কবির এই কাব্যগ্রন্থের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার-কৃত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তায় সুধীর চক্রবর্তীর

শিল্পী: সোমনাথ ঘোষ

ওপর। কবি বিজয়লাল স্মৃতিরক্ষা উপসমিতির সভায় স্যার চাইলেন, ওই সম্পাদনার কাজে আমি যেন তাঁর সহযোগীর ভূমিকা পালন করি। গ্রন্থ-সম্পাদনার কাজ যে কতখানি যত্নের সঙ্গে করতে হয় তা সেই প্রথম জানলাম তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় বসে। নদিয়া জেলা গ্রন্থাগারে পেয়ে গেলাম ওই বইয়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের কপিগুলি। স্যার আমাকে তিনটি সংস্করণের তুলনামূলক একটি চার্ট তৈরি করতে বললেন। তাঁর পরামর্শে তিনটি সংস্করণের তিনটি ভিন্ন কলেবরের বইকে পাশাপাশি রেখে গ্রহণ-বর্জন-পরিমার্জন-পরিবর্ধন ইত্যাদির বিবরণ যথা-সাধ্য সংগ্রহ করেছিলাম। ১৫ অগস্ট ১৯৯২-এ প্রকাশিত এই গ্রন্থের টাইটেল-পেজে স্যার সম্পাদক হিসেবে তাঁর নামের পাশে আমাকে স্থান দিলেন, এ-যে আমার কাছে কী বিরাট প্রাপ্তি ভাবলে রোমাঞ্চ জাগে। স্যারের সুদীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জিতে এমত যুগ্ম সম্পাদনার উদাহরণ আর মাত্র একটিই আছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক মুদ্রিত *রবীন্দ্রনাথ*, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা : সত্যজিৎ চৌধুরী-সুধীর চক্রবর্তী (মে, ১৯৯৯)।

স্যারের কাছ থেকে আমার প্রাপ্তির কি কোনো শেষ আছে? তাঁর লেখা অনেক বই-ই নানা সময়ে 'রামকৃষ্ণ দে, স্নেহভাজনেষু' লিখে স্বাক্ষরসহ তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের সহ-সভাপতি রূপে স্যারই পাঠাগার আয়োজিত বিজয়লালাল স্মারক বক্তৃতা (২০০৫)-র সম্মানমূল্য আমার (বক্তার) হাতে তুলে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্র পাঠাগার প্রবর্তিত দ্বিজেন্দ্র পুরস্কার ২০০৬, আমি পেয়েছি স্যারের হাত থেকেই। সেদিন খানিকটা মজাও হয়েছিল। মঞ্চে প্যান্ট-শার্ট পরিহিত

আমাকে উত্তরীয় পরাতে পরাতে স্যার মন্তব্য করলেন, "রামকৃষ্ণ, আজ তোমার ধুতি পরে আসা উচিত ছিল"। আমি বললাম, "আমি যে ধুতি পরতে পারি না, স্যার"। মাইক্রোফোন সচল। সবাই শুনছে আমাদের কথোপকথন। স্যার আমার উত্তরকে নস্যাৎ করে দিয়ে কথায় কৌতুক মিশিয়ে বললেন, "তুমি বিয়ের সময়ে ধুতি পরনি?" গোটা অডিয়েন্স জুড়ে তখন হাস্যচ্ছটা। অনুষ্ঠানে সেদিন আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এমনকি দিদার কোলে পুঁচকে নাতনিও উপস্থিত। ধুতিপাঞ্জাবি শোভিত স্যার আমার পরিবারের তিন প্রজন্মকে সভায় হাজির থাকতে দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন এবং খুবই মনোগ্রাহী আর আমাদের পরিবারের কাছে প্রেরণাদায়ক ভাষণ দিয়েছিলেন। সেদিনের সেই প্রাপ্তি তাই শুধু আমার একক প্রাপ্তি হয়ে থাকেনি। তা ছিল একটা পারিবারিক অর্জনের মতোই।

এরকম আরেকটি পারিবারিক নন্দিত অর্জনের কথা বলে আমি ওই ঘটনার থেকে বছর তিরিশ পিছিয়ে যাব— যখন আমি গ্রামে-গঞ্জে-শহরে পথ হাঁটছি তাঁর সঙ্গে। হ্যাঁ, এখন যে জায়গায় ছিলাম সেখানেই ফিরি। ২০০১-এর মার্চে প্রকাশিত হল সাড়া-জাগানো গ্রন্থ *বাউল ফকির কথা* (লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ)। স্যার সুধীর চক্রবর্তী, তাঁর এই বিপুল শ্রমলব্ধ গবেষণাধর্মী সৃজনকর্মের জন্য ২০০২-এ 'আনন্দ পুরস্কার' এবং ২০০৪-এ সর্বভারতীয় 'সাহিত্য অকাদেমি' সম্মানে ভূষিত হন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময় আমি ও আমার পুত্র অমৃতাভ (স্যার আমার মতো করেই তাকে 'বাবু' বলে ডাকতেন) তাঁর বৃহদায়তন

কাজের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশে নিজেদের যুক্ত করতে পেরে বাধিত হয়েছি। বাবু স্যারের আগ্রহে একাধিক মানচিত্র তৈরি করেছিল। আর আমার দায়িত্ব ছিল স্যারের তৈরি প্রশ্নমালার উত্তর ফকির-বাউলদের কাছ থেকে সরাসরি শুনে অনুলিখন করা। প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল— একজন লোকশিল্পীর কথাই আমার বিশেষভাবে মনে আছে। তিনি সামুয়েল ফকির, বাড়ি চাপড়া। তাঁর সাক্ষাৎকারটি নেবার সময় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল আমার অনুজপ্রতিম তরুণ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী কার্তিক পাল। সামুয়েল ফকিরের কথা না-ভোলার কারণ, তাঁর জবাবের ভিত্তিতে আমার তৈরি উত্তরপত্রটি স্যার মডেল উত্তর হিসেবে *বাউল ফকির কথা*-য় ছেপে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। অন্যান্যদের সঙ্গে আমার এবং আমার পুত্রের নামও এই মহতী গ্রন্থের স্বীকৃতি অংশে স্যার, উল্লেখ করেছেন। এমন দুর্লভ সম্মান লাভ ক-টা পরিবারের ক্ষেত্রে আর ঘটে? প্রসঙ্গত বলি, আমার পুত্রের প্রতি স্যারের পৌত্রবৎ স্নেহ ছিল অকৃপণ। অমৃতাভ-র (অমৃতাভ দে-র) *কবিতাই কবিতার উত্তর* নামের প্রবন্ধ সংকলনে স্যার অনবদ্য ভূমিকা লিখেছেন— কবিতাপ্রেমী, মরমি অধ্যাপক-গবেষকের কলমে সেটি ছিল আসলে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গভীর গদ্য। বইটি প্রকাশের আগে পাণ্ডুলিপি পড়ে তিনি জরুরি পরামর্শও দিয়েছেন নবীন লেখককে। অমৃতাভ-র আহ্বানে 'দ্বিরালাপ' পর্বের আলোচনাসত্রে গ্রেস কটেজে ও অমৃতাভ-র বাড়িতে আকর্ষণীয় বক্তৃতা দিয়েছেন নতুন প্রজন্মের কলেজ-ছাত্রছাত্রীদের সামনে। স্যারের প্রাপ্ত একটি পুরস্কারের টাকা থেকে স্যার জেলার কয়েকটি লিটিল ম্যাগাজিনকে একদা কিছু

যৌবনে সবান্ধব সুধীর চক্রবর্তী (বাঁ-দিক থেকে প্রথম

অর্থ সাহায্য করেছিলেন। অমৃতাভ দে-গালিব মণ্ডল সম্পাদিত ‘জীবনকুচি’ (প্রকাশক ডাক্তার সুবীরকুমার দে)-ও স্যারের ‘আনুকূল্য লাভ করে সম্মানিত। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারের প্রসঙ্গ একটু আগেই উঠেছে, এই সূত্রে, একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তের ছবিও পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করতে লোভ হচ্ছে। আমি পাত্রবাজারের মুখে দাঁড়িয়ে— স্যারের ইউ বি আইয়ের পাশের গলি দিয়ে বাড়ি ফিরবেন। আমাকে দেখে থেমে গেলেন। একটু পাশে ডেকে নিয়ে বললেন, “রামকৃষ্ণ, শোনো, কবে আবার আমার বাড়িতে তোমাকে পাব (আমি তখন রানাঘাট মহকুমা গ্রন্থাগারে কর্মরত, একটু অনিয়মিত স্যার-সান্নিধ্য পাবার ক্ষেত্রে) জানি না, তাই পথেই দেখাই। সেজদার (দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী তখন অসুস্থ হয়ে গৃহবন্দি) কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম ...”। এই কথা বলে স্যার তাঁর কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ থেকে যে-বস্তুটি বার করলেন, তা দেখে আমার মতো অর্বাচীন বিস্ময়াভিভূত। আসলে, বস্তুটি ছিল সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারের মূল স্মারক। ক-দিন আগেই সস্ত্রীক দিল্লি আমন্ত্রিত হয়ে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। স্মারকটি ছুঁয়ে আমি আনন্দ বিহ্বল। এমন ভাগ্য ক-জনের হয়? আমি ভাগ্যবান। জীবনে আমি যাঁর অনিঃশেষ শুভাশীর্বাদ পেয়ে আসছি, যিনি এত কাছটাতে দাঁড়িয়ে সেই তিনিই অন্যদিকে সর্বভারতীয় সারস্বত সমাজে এক স্বীকৃত, সম্মানিত নাম।

গত শতাব্দীর সাতের দশকের ফিরি। স্যার তখন অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গবেষণার কাজে নদিয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। এই সময় প্রথম তাঁকে খুব কাছ থেকে পেলাম। তাঁর সঙ্গে বৃত্তিহুদা গ্রামে গেছি বেশ কয়েকবার। গেছি হাঁসপুকুরিয়া, গেছি

বর্ধমানের পাঁচলখি গ্রামে। হাঁসপুকুরিয়ার আবু তাহের ফকির কিংবা বড়ো আন্দুলিয়ার দাউদ ফকির প্রমুখ আরও অনেক ফকিরের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে কুবির গোঁসাই, যাদুবিন্দু, দুদ্ধু শাহ প্রমুখ গীতরচয়িতার গান। আমি রাত জেগে সে-সব গান কপি করেছি এবং যথা সময়ে যথাস্থানে গানের খাতা ফেরত দিয়ে এসেছি। এখানে বলে রাখা ভালো দিল্লির এক প্রতিষ্ঠান লোকসংগীত সংগ্রহের জন্য কিছু আর্থিক অনুদান পাঠিয়েছিল। স্যারের সৌজন্যে আমি সেসময় সামান্য হলেও কিছু সম্মান-দক্ষিণা পেয়েছিলাম। এ ব্যাপারে স্যার আমাকে অফিসিয়ালি তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আমারই অক্ষমতা পুরো কাজটি আমি এককভাবে তখন করতে পারিনি, স্যারকে তাই অনন্যোপায় হয়ে আমার অসম্পূর্ণ কাজটি অন্য কাউকে দিয়ে সম্পূর্ণ করাতে হয়। তবে পরবর্তী সময়ে স্যার যখন যেভাবে চেয়েছেন, তাঁর লেখালেখি সম্পর্কিত কাজে, একজন গ্রন্থাগারিক হিসাবে বই-পত্রপত্রিকা-তথ্য ইত্যাদি সরবরাহ করে, আবার একজন পাঠক হিসাবে তাঁর হারিয়ে-ফেলা অথবা ভুলে-যাওয়া লেখা খুঁজে দিয়ে আনন্দ পেয়েছি। সেই প্রথম বই *সাহেব ধনী সম্প্রদায়: তাদের গান* (১৯৮৫) থেকে শুরু করে ২০১৯ পর্যন্ত বলা যায় অতিমারিজনিত দুঃসময়ের আগে পর্যন্ত স্যারের হাতে-থাকা প্রকাশমান কাজ (যেমন রাজশেখর বসুর গল্প সমগ্র সম্পাদনা)-এর সূত্রেও তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। তাঁর কিছু লেখার প্রেসকপি তৈরি করা এবং তাঁর মুখে শুনে শুনে কিছু লেখার প্রতিলিপি করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ছাপার আগেই তাঁর পাণ্ডুলিপির পাঠক হতে পারা

কিংবা তাৎক্ষণিক রচনার শ্রোতা হতে পারা তো আমার কাছে সৌভাগ্যের বিষয়। বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রস্তুতির সময় তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভের সুন্দর ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী অনেক অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। তেমন অসংখ্য ঘটনার মধ্যে মাত্র দু-তিনটির কথা এখানে বলি। 'গানমেলা' শিরোনামে 'আজকাল' পত্রিকায় প্রতি রবিবার স্যার ধারাবাহিকভাবে লিখছিলেন সাপ্তাহিক কলম। বিশেষ পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছিল জনপ্রিয় গান নিয়ে দু-বছর ধরে লেখা একশোটির মতো লেখা। বই করবার সময় আমার কাছে জমানো ওই লেখার কাটিংগুলির সঙ্গে স্যারের ফাইলে রাখা মুদ্রিত লেখার জেরক্স কপিগুলি মেলাতে গিয়ে কিছু বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। যতদূর মনে আছে, বিভ্রান্তি দূর হল দে.মু-র পাঠানো কমপ্লিট ফাইলটি পেয়ে। এদিকে প্রকাশকের তাড়া। যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে কাজ এগোল। গ্রন্থে গানগুলি কেমনভাবে বিন্যস্ত করা যায়, সূচিপত্র একটি না একাধিক হবে তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করা হল। অবশেষে সুবিন্যস্ত, সুমুদ্রিত দৃষ্টিনন্দন বইটি চাক্ষুষ করে স্বস্তি।

'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার 'রোববার'-এ স্যার দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক কলম লিখেছেন 'দেখা না দেখায় মেশা'। এই ধারাবাহিকটিও পাঠক সমাদর পেয়েছিল খুব। সাধারণের চোখে হয়তো সাধারণ ঘটনা কিন্তু দেখার এবং দেখানোর গুণে তা যে কেমন হৃদয়স্পর্শী হতে পারে, ভাবাতে পারে পাঠককে, তারই বহু দৃষ্টান্ত এই রচনায়। লেখাগুলি যখন বই হয়ে বেরবে, তখন স্যার ডেকে বললেন, "রামকৃষ্ণ, একটা সাদা কাগজে নির্দিষ্ট স্পেস রেখে রেখে কালো কালিতে শিরোনামগুলি তুমি লেখো।

প্রকাশক আমার পাণ্ডুলিপির প্রেসকপিতে কোথাও কোথাও তোমার হাতের লেখা দেখেছেন। তার ইচ্ছা এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম তোমার হস্তলিপিতে হোক।" স্যারের আদেশ আমার কাছে শিরোধার্য। সংশয় নিয়ে আমি কাজটি করলাম। সংশয়, কারণ স্পষ্ট অক্ষরে, খানিকটা পরিচ্ছন্ন পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে পারলেও, আমি তো শিল্পী নই। কাজটি আমার নিজেরও বিশেষ মনঃপূত হল না। কিন্তু স্যার তাই-ই ব্যবহার করলেন তাঁর বইয়ে। নিজ হাতে উপহারও দিলেন সেই আমাকে সেই বইয়ের একটি কপি। এখন বুঝতে পারি, কারও মধ্যে কোনো সম্ভাবনার আভাস মিললেই সেই সম্ভাবনাকে উৎসাহ জোগাতে তিনি ছিলেন অকৃপণ বন্ধু। আমি স্বভাবজ আলস্য আর বাস্তব পরিকল্পনার অভাবে এত স্নেহ পেয়েও তাঁর যোগ্য-শিষ্য হয়ে উঠতে পারিনি।

পরের ঘটনাটি খুব বেশি দিন আগের নয়। স্যারের রচনাবলি প্রকাশের প্রস্তুতি চলেছে। স্যার একদিন ফোন করলেন, "আজ একটু সময় হাতে নিয়ে এসো"। স্যারের ঘরে পৌঁছে দেখি, স্যারের লেখা কয়েকখানা বই বসবার ঘরের খাটে ছড়ানো। আমাকে বললেন, "রামকৃষ্ণ, শোনো, আমার যে রচনাবলি প্রকাশিত হতে চলেছে, সেখানে এই বইগুলি যাবে। সংকলনের শেষ পাতায় থাকবে সন্নিবেশিত মূল বইগুলির প্রকাশ-তথ্য। তুমি গ্রন্থাগারিক ছিলে, অতএব গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-সম্মত তালিকা তৈরির দায়িত্ব তোমার।" আমাদের সামনে অনুসরণযোগ্য বই হিসেবে স্যারের আলমারিতেই ছিল খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের গদ্যরচনা সমগ্র। শঙ্খবাবুর বইকে দৃষ্টান্ত হিসেবে

নিয়ে *সুধীর চক্রবর্তী রচনাবলি*-র প্রকাশতথ্য অংশটি লিখলাম। স্যারের সানন্দ অনুমোদনও পেলাম। মুদ্রিত গ্রন্থ হাতে পাবার পর দেখি আমার ওই সামান্য কাজকেও স্যার স্বীকৃতি দিয়েছেন 'আত্মপক্ষ' অধ্যায়ে।

আর একবার একটি গ্রন্থ সম্পাদনার প্রাথমিক পর্বে স্যারকে খানিকটা তাঁর স্বভাব-বিরোধী উচ্ছ্বাসের মধ্যে দেখলাম। আমাকে বললেন, "তোমাকে একটা বই জোগাড় করে দিতে হবে। সেটা রাজশেখর বসুর ওপর লেখিকার থিসিস পেপার ছিল। লেখিকার নাম কল্যাণী ঘোষ (?)। আমি দেশ পত্রিকায় এক সময় বইটির রিভিউ করেছি। কিন্তু এখন আর সে বইটি আমার কাছে নেই। [...] আনন্দ পাবলিশার্স আমাকে নবপর্যায় প্রকাশমান পরশুরাম গল্পসমগ্র সম্পাদনার ভার দিয়েছে। এরকম দায়িত্ব পেয়ে আমি খুশি কেন-না, এর আগে এই গ্রন্থ- সম্পাদনা করেছেন, আমার স্যার প্রমথনাথ বিশী।" আসলে, অন্য কোনো গুরুতর ক্ষেত্রে নয়, আমাদের 'স্যার' শ্রদ্ধেয় সুধীর চক্রবর্তীকে কিছুটা আবেগপ্রবণ হতে দেখতাম যখন তিনি তাঁর মাস্টারমশাইদের (চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ভবতোষ দত্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়-দের) কথা বলতেন। এই তো মাত্র বছর চারেক আগেও আমাদের অনুরোধে বড়ো আন্দুলিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে (প্রয়াত প্রধান শিক্ষক জ্যোতিষচন্দ্র দাসের স্মরণায়োজনে) এসে 'আমার মাস্টারমশাইরা' শিরোনামে অসাধারণ ভাষণ দিলেন।

এবার গুটিয়ে আনতে হবে। তাঁর সম্পর্কে লিখতে গেলে বারবার খেই-হারানোর আশঙ্কা। তবু যা বললাম তার উদ্দেশ্যেটি

এই যে, সম্পর্কের অন্তরঙ্গতার সূত্রে বুঝেছি, লেখা ও গবেষণার কাজে এমন পরিশ্রমী, এমন সাংগঠনিক, এমন সময়ানুবর্তী, এমন মেথডিক্যাল মানুষের কথা আমি আর জানি না। সমস্ত কাজে পরিচ্ছন্নতা, রুচিশীলতা আর সপ্রতিভতা। তাঁর গবেষণা পর্বে তাঁর সঙ্গে যখন গ্রামে-গঞ্জে-শহরে হেঁটেছি তখন তাঁর ক্লান্তিহীন পদক্ষেপ বিস্ময় জাগাত। মাঝেমাঝেই ভুলে যেতাম তিনি আমার থেকে ষোলো বছরের বড়ো। কোনো ফকির-বাউল বা দরবেশের কাছে যাওয়ার আগে তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেতাম। কীভাবে যাব, কোথায় আমরা একত্রিত হব, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যাপার থাকলে কোথায় সে-পর্ব সারা হবে সমস্তই লিখে পাঠাতেন। অনেক সময় আগেই হাতে এসে পৌঁছোত রঙিন লেটার হেডে বাঁধিয়ে রাখার মতো হাতের লেখায় স্যারের প্রশ্নমালা সম্বলিত পত্র। আমি সেই প্রশ্নমালা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মানুষদের কাছে যেতাম। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করে প্রাথমিক কাজ এগিয়ে রাখতাম। আসলে যে-কোনো কাজ সুচারুভাবে সম্পাদন করার, যে-কোনো অনুষ্ঠান শিল্পসম্মতভাবে উদ্‌যাপন করার প্রেরণা তাঁর সান্নিধ্যধন্য অনুজেরা তাঁর কাছ থেকে লাভ করেছেন।

প্রজ্ঞার সঙ্গে প্রাণ, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসপ্রিয়তার সুসমঞ্জস মিশেলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল একইসঙ্গে সপ্রতিভ ও সুপ্রভ। তাঁর লেখায়, তাঁর ভাষণে, তাঁর সমগ্র যাপনে যে-দ্যুতি তাকে বাড়তি বিভা দিয়েছে তাঁর কৈশোর থেকে লালিত (সেজদা দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর প্রেরণায় প্রাপ্ত) দুটি মহতী গুণ— এক নিখুঁত সময়ানুবর্তিতা, দুই বাস্তব পরিস্থিতি অনুস্যূত পরিমিতি।

স্যার সব বিষয়েই ছিলেন পরিমিত, সুশৃঙ্খল— কিন্তু আমার মনে হয়েছে একটি ব্যাপারেই তিনি ছিলেন অপরিমিত এবং তা হল, আমার এবং আমার মতো অসংখ্য তাঁর ছাত্র বা ছাত্রপ্রতিম, ভ্রাতৃপ্রতিম পুত্রপ্রতিম অথবা পৌত্র-দৌহিত্র-প্রতিম স্নেহভাজনদের প্রতি তাঁর অবারিত স্নেহ সিঞ্চনে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, বিগত প্রায় তিরিশ বছরে আমার কত আবদারই-না তিনি সহ্য করেছেন। আমার নানা সময়ের তিনটি কর্মস্থলেই তিনি গেছেন এবং অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেছেন। বড়ো আন্দুলিয়াতে গেছেনই, গেছেন রানাঘাট মহকুমা গ্রন্থাগারে, এসেছেন নদিয়া জেলা গ্রন্থাগারে। মনে পড়ে, ঘূর্ণি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিতে সেবার আশাপূর্ণ দেবীর স্মরণসভা হল, অল্প সময়ের নোটিশে। স্যার আমাকে ফেরাতে পারলেন না। আমি তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবেই নিয়ে গেলাম জেলা গ্রন্থাগারে। সেদিনের শ্রোতারা অভিভূত তাঁর ভাষণে— প্রস্তুতিহীন অথচ কী গভীর, গাঢ় আশাপূর্ণা-স্মরণ। অল্পকথায় সাহিত্যসম্রাজ্ঞীর দীপ্র মূল্যায়ন। এ কাজটা স্যারই পারেন।

সালটা ১৯৯২। বড়ো আন্দুলিয়া থেকে প্রকাশিত অতি ক্ষুদ্র কলেবর পত্রিকা 'চোখ'-এর তরফে আমরা (সঙ্গে ছিল অম্বিকা-জয়নাল-হজরত-রমজান-সুবীর) ঠিক করলাম পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যাটি হবে সুধীর চক্রবর্তী সংবর্ধনা সংখ্যা। মাত্র চব্বিশ পাতার দীন আয়োজনে সুধীর-প্রণাম। শিল্পী আশিস চৌধুরী সেই প্রথম স্যারের একটি স্কেচ আঁকল। স্যার তাঁর কবিতার ডায়েরি তুলে দিলেন আমার হাতে। তার থেকে দুটি কবিতা ছাপলাম আমরা। স্যারের সামনে বসে সেই প্রথম স্যারের একটি গ্রন্থপঞ্জি (তখন

পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের) প্রণীত হল। আমরা সৌভাগ্যবান, সেই প্রথম তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি মুদ্রিত হল আমাদের নিতান্ত নগণ্য এক কাগজে তাঁরই অনুমোদন সাপেক্ষে।

শেষ করব আর একটি মাত্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। 'বিরুদ্ধস্রোত' পত্রিকা (সম্পাদক: অম্বিকা দে) আমার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আমাকে উপহার দিল ভালোবাসার উষ্ণতায় তৈরি 'রামকৃষ্ণ দে মুগ্ধ যাপন সংখ্যা' (অতিথি সম্পাদক: কবি সঞ্জীব প্রামাণিক)। এই সংখ্যার একটি রচনায় ('রামকৃষ্ণ মিশন') স্যার তাঁর প্রাণের আশীর্বাদ উজাড় করে দিলেন আমার মাথায়— যা এখন পর্যন্ত আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ওই রচনায় আমাকে তিনি তাঁর জীবনের 'এক সুন্দর অর্জন' বলে উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন এমন অনেক কথা যা এ সময় বললে নির্লজ্জ এক আত্মপ্রচারই মনে হবে। তবে আমার উপলব্ধিতে বিষয়টি এইরকম— পিতা যেমন তাঁর পুত্রকে 'বাবা' সম্বোধন ফিরিয়ে দিয়ে আনন্দ পান, ঠিক তেমনই আমার জন্য স্যারের দেওয়া বিশেষণ এবং যা-কিছু মূল্যায়ন সব তাঁরই মহানুভবতার পরিচায়ক।

পিয়ালী রায়

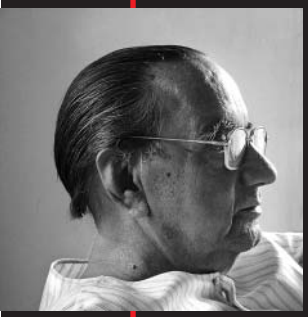

আমার আমারই থাকুন

১৯৮০-তে দ্বিজেন্দ্রপুত্র দিলীপকুমার রায়ের প্রয়াণের পর নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগারে স্মরণ অনুষ্ঠান। বক্তৃতা করতে এলেন ধুতিপাঞ্জাবি পরিহিত দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক। আমি তখন ক্লাস ফোর। বক্তৃতা শোনার মতো ধৈর্য স্বভাবতই তৈরি হয়নি। কিন্তু আদর্শ পাঠাগারের শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য আর মায়ের বকুনির ভয়— দুটোর তাগিদেই চুপ করে বসে থাকতে হবে। মানুষটি বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। কথার মাঝখানেই গান ধরলেন। এবার বেশ অবাক হলাম। বাপরে কি গাইছেন!

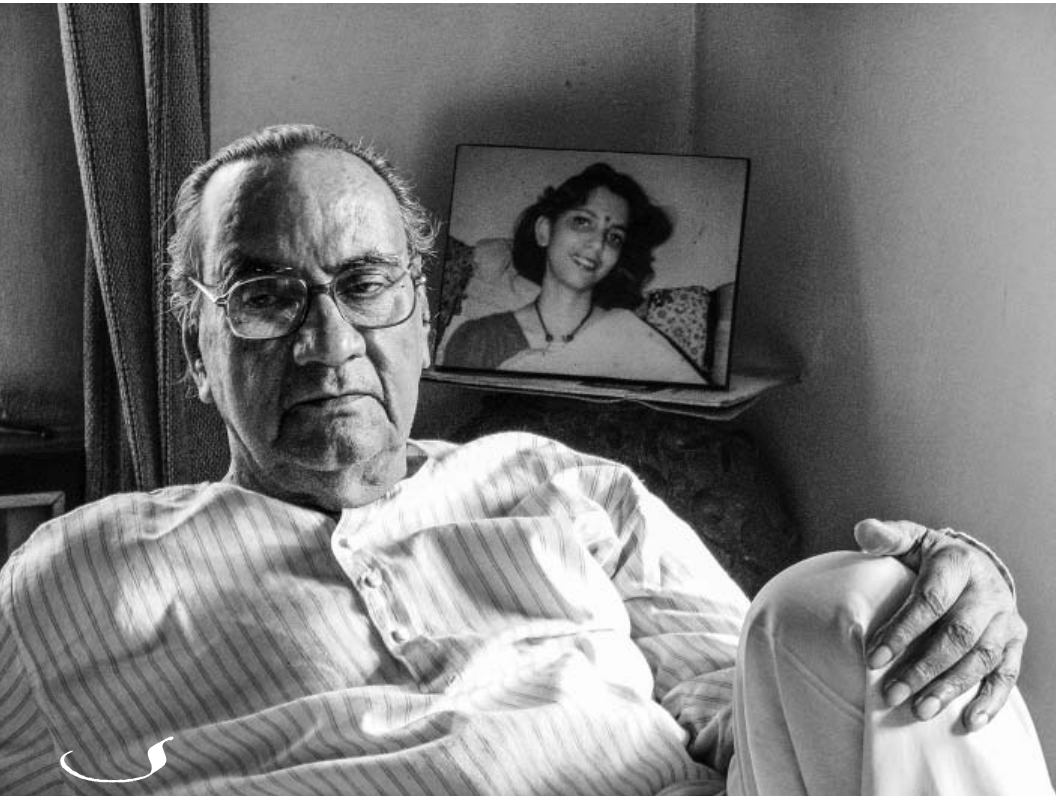

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ

বক্তৃতা কতটা বুঝলাম না-বুঝলাম জানি না কিন্তু ভদ্রলোকের গান আমার ছোট্ট হৃদয়খানি দুলিয়ে দিয়ে গেল। শুনলাম ওঁর নাম অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী।

আমরা তখন নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগরে পাকাপাকিভাবে চলে আসার তোড়জোর করছি। আমরা জেঠু বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মেয়ে শ্বেতাদি অসম্ভব ভালো দ্বিজেন্দ্রগীতি গাইত। ১৯৮০-তে আমার দিদি লাভলী রায়কে জেঠু কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রগীতির একটি প্রতিযোগিতায় গান গাওয়ানোর জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। শ্বেতাদির কাছ থেকে শেখা 'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই' গানটি আরও পরিমার্জনের জন্য জেঠু অনুরোধ জানালেন সুধীরবাবুকে। দিদি তখন সদ্য মাধ্যমিক পাশ করেছে। 'ভেসে যাই' শব্দদ্বৈতের ওপর যে-গমকের কাজ তা শিখল দিদি। আর দিদির গলায় শুনে শুনে ছোট্ট আমি। এরপর একাশি সালে আমরা কৃষ্ণনগর চলে এলাম স্থায়ীভাবে। শহরের বিভিন্ন গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছি। এমনই এক দ্বিজেন্দ্রগীতি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে আবার তাঁকে শুনলাম। এবার 'নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো' আর 'বুড়োবুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত'। শৈশব থেকে সদ্য কিশোরীবেলায় পা-রাখা আমি তখন কিছুটা পরিণত মনস্ক। মাতৃহারা মন্টু আর মায়া দ্বিজেন্দ্রলালের 'যথা' আর 'সর্বস্ব'র ব্যথায় এখন একাত্ম হই। দ্বিজেন্দ্রজীবনীর এমন সজীব উপস্থাপন আর গান বুদ্ধি ও মন দুটোকেই পরিপুষ্ট করল। এরপর নানা অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ঘনঘন দেখা। আশির দশকে কৃষ্ণনগর শহরে সুধীর চক্রবর্তীর সগান দ্বিজেন্দ্রজীবনীর নির্মেদ পরিবেশনই ছিল দস্তুর। এমনই

এক অনুষ্ঠানে আমার কচি কণ্ঠের গান তাঁর ভালো লাগল। অনুষ্ঠানে কাকিমা মানে স্যারের স্ত্রী নিবেদিতা চক্রবর্তীও ছিলেন। তিনি এসে আমার মায়ের সাথে পরিচয় করলেন। আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের বাড়িতে। তখন শ্রেয়া (স্যারের কনিষ্ঠা কন্যা)ও প্রায় আমার বয়সি। ক্রমশ আমার প্রথম সংগীতগুরু সোনাকাকু দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মেয়েরও সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। সেই শুরু।

গানের সূত্রেই যুক্ত হলাম শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারে। কাছে টেনে নিলেন মাস্টারমশাই দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, যিনি সম্পর্কে স্যার সুধীর চক্রবর্তীর সেজদা। আরও বেশি করে দ্বিজেন্দ্রগীতির সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল দুই বোনের। স্যারের কাছেই শিখেছি কীভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের গানে একেকটি শব্দের ওপর গমকের কাজ বা কোন শব্দটি একটু টেনে বলতে হবে বা টপ-খেয়াল বা টপ্পা ও খেয়ালের সংমিশ্রণে মীড়ের কাজ কেমন করে গাইতে হয়। স্যার হারমোনিয়াম বাজাতেন না, খালি গলায় ওরকম স্বর লাগাতে গেলে স্বরের ওপর কতটা দক্ষতা ও সাংগীতিক প্রতিভা দরকার তা বলা বাহুল্য। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত টপ-খেয়াল ‘মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে’ গানটির দ্বিতীয় লাইনে ‘মম তৃষিত অন্তরব্যথা’ এই ‘ব্যথা’ শব্দটিতে টপ্পার যে ‘দানা’ তা স্যারের গলায় যেমনটি শুনেছি তা আর কারো গলাতেই পাইনি। ‘আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার’ গানটিতে ‘স্মৃতিজোয়ারে’ শব্দটির স্বরক্ষেপণে যে নাটকীয় ওঠানামা তা-ও তাঁর স্যারের কাছ থেকেই শেখা। মাস্টারমশাই আমাদের পাঠাগারের কিশোরবাহিনীকে নিয়ে একদিন স্যারের বাড়ি

চললেন 'ধনধান্যপুষ্পভরা' গানটি সঠিক ভাবে গাওয়া শেখাতে। প্রচলিত সুর বেশ খানিক ভুলতে হল। 'পুষ্পভরা' শব্দটির 'রা'-এর উপর গমকের কম্পন বা 'রা-আ-নি'র বদলে 'রাণি' বলতে শিখলাম। এভাবেই চলছিল তালিম। কৃষ্ণনগর তথা নদিয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় তখন দ্বিজেন্দ্রলালের গান গাইতে ডাক পড়ত শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের শিল্পীদলের। আর পাঠাগারের গানের দলের সদস্য হবার সুবাদে আমাদের দুই বোনের উপর একক‌সংগীত পরিবেশনের গুরুদায়িত্বটি অর্পণ করেছিলেন মাস্টারমশাই দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী। আশির দশকে দ্বিজেন্দ্রচর্চার একটা ধারা কৃষ্ণনগরে প্রবাহিত ছিল। সমীরেন্দ্র সিংহ রায়, নির্মল দত্ত, অনন্ত মিত্র, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলি, নির্মল সান্যাল, শিখা সান্যাল, অসীমানন্দ রায়, অসীমানন্দ মজুমদার, গীতা পান্ডে, সলিল ঘোষ প্রমুখের হাত ধরে। আর এ ব্যাপারে অবশ্যই মধ্যমণি ছিলেন আমাদের স্যার সুধীর চক্রবর্তী।

১৯৮৮ কি ৮৯-এর প্রথমদিক। গভর্নমেন্ট কলেজে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ি। হঠাৎ কলেজের প্রফেসরস রুম থেকে ডাক পড়ল। দুরুদুরু বক্ষে ঢুকলাম সেখানে। স্যার বসেছিলেন। কোনো একজন প্রফেসরের ফেয়ারওয়েল (কার ভুলে গেছি এখন), তাই আমায় দ্বিজেন্দ্রগীতি গাইতে হবে। সেখানে আমি ছাড়া আর কোনো ছাত্রছাত্রীর প্রবেশাধিকার ছিল না। বন্ধুরা বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমার 'হেসে নেও দুদিন বইতো নয়' শুনল। সেদিন বন্ধুদের চোখে মুখে একটু সমীহ, যা ওই বয়সে খানিক উপভোগ করলাম তো বটেই। অবশেষে স্যারের গলায় 'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই'। আবার মুগ্ধতা। কলেজে স্যার

একদিনই ছোটোগল্প পড়াতে ক্লাসে এসেছিলেন। সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এর অসামান্য একটি গল্প বলেছিলেন, যা আজও মনে দাগ কেটে আছে।

এরপর কলকাতায় সুশীল চট্টোপাধ্যায়-এর কাছে দীর্ঘদিন মূলত অতুলপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রসংগীতের তালিম চলল দুই বোনের। এখানে এসেও পেলাম সেই একই গোবিন্দগোপালীয় ঘরানা। কারণ স্যার সুধীর চক্রবর্তী ও সুশীল চট্টোপাধ্যায় দুজনেই গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর ছাত্র। মাস্টারমশাই সুশীল চট্টোপাধ্যায় যেমন গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর কাছ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গান শিখেছেন তেমনি আবার গোবিন্দগোপালবাবু তাঁর স্ত্রী মাধুরীদেবীকে বাংলাগানের অন্যান্য ধারার গানগুলির প্রশিক্ষণের ভার দিয়েছিলেন সুশীলবাবুকে। আমাদের দুই বোনের পরম সৌভাগ্য সুশীল চট্টোপাধ্যায় ও সুধীর চক্রবর্তী দুজনের কাছ থেকেই গান শেখার সুযোগ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত একাদেমির অতুল-রজনী-দ্বিজেন্দ্রগীতির কর্মশালায় পরিচালক সুভাষ চৌধুরী ও অন্যরা যখন দেখতাম আমাদের স্যারের বই থেকেই ডিকটেশন দিচ্ছেন তখন গর্বে বুকটা ফুটে উঠত। এখনও দুই বাংলা জুড়ে এই তিনজনকে নিয়ে প্রামাণিক লেখনীর তিনিই শেষ কথা।

২০০৬-এ মাস্টারমশাই দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী চলে যাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের সভাপতি নিযুক্ত হলেন স্যার। এর অনেক আগে থেকেই তিনি পাঠাগারের পরিচালন সমিতির সদস্য আর তারও আগে থেকে হাতে লেখা ‘বর্তিকা’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ও ক্রিকেট দলের স্কোরার। কিন্তু পিতার মৃত্যুর

পর সংসারের জ্যেষ্ঠ সন্তান যেমন পরিবারের দায়িত্ব হঠাৎ করে নিজের কাঁধে তুলে নেয়, স্যারও ঠিক তেমনি আমাদের পাঠাগার পরিবারের দায়ভার বহন করতে লাগলেন। আরও নিবিড় করে পেলাম তাঁকে। বিজয়া সম্মেলনে প্রতিবারই আমাদের নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা থেকে। আখতারি বাঈ থেকে সলিল চৌধুরী, সলিল চৌধুরী থেকে সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, পুজোর গান, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় মায় সিরিয়ালের গান সবেতেই স্যারের অনায়াস গতায়াত। আর আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা তিনি। গানের ব্যাপারে কোনোরকম ছুৎমার্গিতা তাঁর ছিল না।

স্যারের সত্তর বছর উপলক্ষ্যে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে 'সুধীর সত্তর' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। স্যারের ইচ্ছায় দিলীপকুমার রায়ের 'মরি রূপে বর্ণে ছন্দে' গানটি সেদিন গেয়েছিলাম। আজ ভাবি কত বড়ো সম্মান স্যার আমাকে দিয়েছেন। শুধু দ্বিজেন্দ্রলালই নয়, অতুলপ্রসাদ সেনের গানেও ছিল তাঁর অনায়াস দক্ষতা। স্যারের বেশ কিছু ক্যাসেটবদ্ধ গান যা স্যার দিয়ে গেছেন, আমার সংগ্রহে আছে। একদিন সেগুলো বাড়িতে বাজানো হচ্ছিল। হঠাৎ বেজে উঠল 'তুমি কবে আসিবে মোর আঙিনায়'। আক্ষরিক অর্থে পাগল হয়ে গেলাম সেই গান শুনে। বারবার রিওয়াইন্ড করি ক্যাসেটের ফিতে। সেদিনই গলায় তুললাম সে-গান। কিছুদিন পর ডক্টর নন্দীর বাড়িতে স্যারকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমন্ত্রিত হলাম শিল্পী হিসেবে। স্যারকে শোনালাম সেই গান। পরে স্যারের কাছে জেনেছি এ গানের সুরকার সন্তোষ সেনগুপ্ত, যিনি নিজে স্যারকে এই গান শিখিয়েছেন।

বন্ধু সৌমিত্রর সঙ্গে

২০১২-তে দ্বিজেন্দ্র সার্ধশতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগারের সংগীতদলের সদস্যদের নিয়ে দ্বিজেন্দ্র সংগীতের একটি অ্যালবাম প্রকাশিত হল। গান নির্বাচন থেকে গানের সুর সব কিছুই স্যারের তত্ত্বাবধানে। রিহার্সালে তাঁর উপস্থিতি আমাদের উদ্দীপিত করত। অ্যালবামটির প্রাককথন রেকর্ডিং করতে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় আমাদের সাথে ছুটে গেছেন তিনি। গলার কারণে অনেকদিন তিনি আর গাইতেন না। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করতেন গান তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে বলে। তবুও 'রত্নধান্য পুষ্পিতা', যা 'ধনধান্যপুষ্পভরা'-র সংস্কৃত ভার্সন, গানটি আমাকে তুলিয়ে দিয়েছিলেন। সরাসরি গান ওই শেষ শুনেছিলাম।

২০১৮-তে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার পঁচাত্তর বছরে পদার্পন করল। একই সাথে মাস্টারমশাই দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর শতবর্ষ। সবাই চাইছিল একটা অন্যরকম কিছু হোক। গত সাত-আট বছর ধরে একটা ইচ্ছা মনে লালন করছিলাম, কিন্তু সংকোচবশত কাউকে সেকথা বলতে পারিনি। কপালঠুকে স্যারকে একদিন বলেই ফেললাম রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি অন্য আঙ্গিকে ভেবেছি এবং তা রবীন্দ্রভবন মঞ্চে মঞ্চস্থ করতে চাই। স্যার খানিক চুপ করে থেকে বললেন 'বেশ'। বলে তো দিলেন। কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ করতে যে টেকনিকাল জ্ঞান দরকার সে-সম্পর্কে তো আমি অজ্ঞ। স্যার কৌশিকদা—অভিনেতা ও নির্দেশক কৌশিক চট্টোপাধ্যায়কে ডাকলেন বাড়িতে। কৌশিকদা সবরকম পরামর্শ দিয়ে আমাদের নাটক করতে উৎসাহ দিলেন। আর রুনুদা (মঞ্চ-নির্দেশক রণজিৎ চক্রবর্তী) মঞ্চ সাজিয়ে,

সকলকে বকাঝকা করে পার্ট মুখস্ত করিয়ে আমাদের নাটকটা ভালোভাবে উৎরে দিলেন। নাটকটা যেদিন প্রথম পড়লাম সেদিন রাত্রে স্যার আমাদের বাড়ি এসে সবটা শুনে বললেন, "সুদর্শনা তুমিই কোরো"।

বহুমুখী সৃষ্টিশীল মানুষটির সাংসারিক দায়িত্বপালনে কোনো ত্রুটি ছিল না। জীবন্মৃত জ্যেষ্ঠা কন্যার সেবা করতেন নিজের হাতে। এ নিয়ে কখনও তাঁকে উষ্মা প্রকাশ করতে দেখিনি। বয়স্য নয়, নবীনরাই ছিল তাঁর সহচর। আপাত গাম্ভীর্যের আড়ালে ছিল একটি হাস্যরসিক সংবেদনশীল মন। ছোটো-ছোটো আবেগগুলো ভাষায় প্রকাশ না-করলেও আচরণে তা স্পষ্ট হয়ে উঠত। ভালোবাসার মানুষগুলোর খারাপ-ভালোর দিকে নজর ছিল প্রখর। এ প্রসঙ্গে একদিনের ঘটনা মনে পড়ে গেল। দ্বিজেন্দ্রমঞ্চে 'এস. এন. সময়' নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। পাঠাগার পরিচালন সমিতির স্যারসহ আরও অনেকেই উপস্থিত। আমি স্কুল ফেরত সরাসরি প্রেক্ষাগৃহে চলে গেছি। স্যার আমার স্বামী চন্দনকে আমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন। কিছুক্ষণ পর বড়োসড়ো একটা কাগজের ঠোঙায় সবার জন্য সিঙাড়া নিয়ে চন্দন ঢুকল। 'আমি তো সিঙাড়া খাই না'—একথা বলতেই স্যার চন্দনকে তিরস্কার করলেন। কারণ একসাথে থেকেও কেন এই সামান্য কথাটা ও জানে না।

মানুষ হোক বা নতুন টেকনোলজি—সব ব্যাপারেই স্যারের আগ্রহ ছিল প্রবল। বহতামান জীবনের প্রতিটি ঘটনাই ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাই তো তাঁর লেখনীতে বারবার সাধারণ মানুষের

কথা উঠে এসেছে। এ শহরের রিকশাচালক, সবজি বিক্রেতা, রং মিস্ত্রি, মাছবিক্রেতা—সবার তিনি স্যার।

অসম্ভব খাদ্যরসিক ছিলেন। আমাদের বাড়ির সামনে খুব ভালো খাসির মাংস বিক্রি হয়। প্রায়ই চন্দনের দায়িত্ব পড়ত সেই মাংস কিনে স্যারের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। আমাদের বাড়ির দোতলা সম্পূর্ণ হবার পর নিজেই এক রোববারের দুপুরে বাড়ি দেখতে আসতে চাইলেন। সঙ্গে অবশ্যই খাওয়াদাওয়া। মাটন না চিকেন জিজ্ঞাসা করলে স্যার উত্তর দিলেন, "চিকেন আবার মাংস নাকি?" আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও, সবাই স্যারের ছাত্রছাত্রী, এসেছিল সেদিন। অনেকক্ষণ গল্প করে স্যার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিলেন।

জেলুসিল, এন্ট্রোকুইনল সেবনে অভ্যস্ত বাঙালি তিনি মোটেও ছিলেন না। গরম-গরম ফুলকো লুচি, কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সাহুজির চপ বা করুণাময়ীর সিঙাড়া, কিছুতেই তাঁর না ছিল না। গত বছর পাঁচই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন স্যারের বাড়ি যাব— ভাবলাম বিরিয়ানি নিয়ে যাই। জানি স্যার মাটন খেতেই বেশি পছন্দ করেন, তবুও রাতে খাবেন, বয়স্ক মানুষ এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ফোনই করলাম— "স্যার মাটন বিরিয়ানি না চিকেন বিরিয়ানি?" ফোনের ওপ্রান্ত থেকে উত্তর এল "মাটন মাটন"। সন্ধেবেলা স্যারের বাড়ি ঢুকলাম বিরিয়ানির প্যাকেট হাতে। খানিক বাদে বিদ্যুৎদা এলেন সাহুজির চপের ঠোঙা হাতে। গরম-গরম চপে তৎকক্ষণাৎ কামড় দিলেন স্যার। এখন শুনছি চিকিৎসকরা বলেছেন স্যারের নাকি অনেকদিন ধরে ডায়াবেটিস! কী করে বুঝব! ক্লান্তি কি জিনিস সদ্য

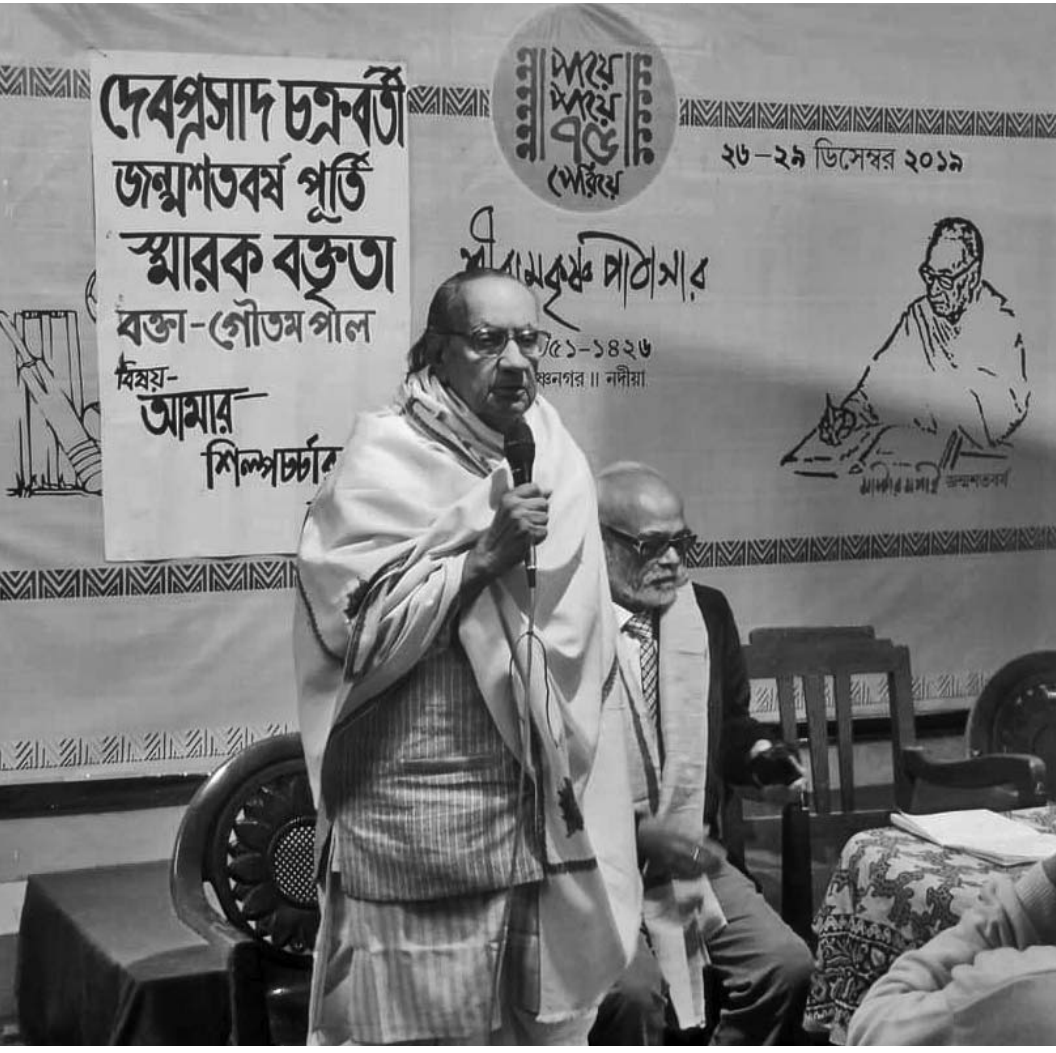

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের অনুষ্ঠানে সুধীর চক্রবর্তী

সাতাশিতে পা রাখা এই টগবগে যুবককে দেখে তো বিন্দুমাত্র বুঝিনি। বিজয়মোদকের পান্তুয়া আর নলেনগুড়ের সন্দেশের আস্বাদে বিভোর ছিলেন। আর ভালোবাসতেন নানারকমের বিস্কুট। একদিন আমার দিদি লাভলী ওয়েফার জাতীয় ট্রেন থেকে কেনা খুব কম দামের কী একটা বিস্কুট স্যারকে খেতে দিল। খেয়ে বলেন "অমূল্য"। বাড়ি গেলেই প্রথম কথা, "আজ কী রান্না হল?" কোয়ান্টিটি নয়, কোয়ালিটি ফুডে আস্থা রাখতেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ৮৬ অতিক্রম করে ৮৭ তে পা রাখলেন। সন্ধেবেলা আমি আর চন্দন স্যারের জন্য একটা খদ্দরের ফতুয়া আর পাজামা নিয়ে দেখা করতে গেলাম। কী খুশি হলেন! ফতুয়াটা সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেট থেকে বের করে গায়ে পরলেন। বললেন পাজামাটা নাকি স্যারের খুব দরকার ছিল। মুখে শিশুর সারল্য। ২০১৪-তে বাবা চলে যাবার পর আমরা দুই বোন বাবাকে সৎকার করতে গেছি নবদ্বীপ। বারংবার চন্দনের কাছে ফোন করে আমাদের খবরাখবর নিয়েছেন। পরের দিনই বাড়িতে হাজির। মাস্টারমশাই চলে যাবার পরও আমাদের দুই বোনকে আদেশ করেছিলেন নবদ্বীপ যেতে আর অস্থিকলস গঙ্গায় ভাসাতে। সেদিনও তিনি আমাদের সঙ্গী।

পাঠাগারের অনুষ্ঠান থাকলে আধাঘণ্টা আগেই স্যার উপস্থিত আমাদের বাড়ি। এসেই বলতেন "একটু চা করো"। এই অতিমারি পর্বে দু-দিন তিনি আমাদের বাড়ি এসে অনলাইন লাইভ অনুষ্ঠান করে গেছেন। চৌঠা শ্রাবণ দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মদিনে স্যারের বক্তৃতা আর রেকর্ডে ধৃত তাঁর কিছু পুরোনো দ্বিজেন্দ্রগীতি শুনে বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ আপ্লুত হয়েছিলেন। বিশে অক্টোবর

অতুলপ্রসাদ সেনের জন্মদিন। আমরা দুই বোন আর স্যার আবার ফেসবুক লাইভে অনুষ্ঠান করলাম। এদিনও দর্শক শ্রোতা স্যারের প্রাণবন্ত ভাষণ আর অতুলপ্রসাদীতে মজলেন। এটাই স্যারের শেষ অনুষ্ঠান। আমার হাতে রান্না চিংড়ি মাছের একটি বিশেষ পদ স্যার খেতে ভালোবাসতেন। এই দু-দিন রাতেই স্যার রাতের খাবার খেয়ে চন্দনের বাইকে চড়ে বাড়ি গেছেন। স্যারকে নিয়ে মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখার একটা প্ল্যানও সেদিন হল।

১৫ নভেম্বর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চলে গেলেন। জানি না কেন পরের দিনই আমার স্যারের জন্য মনটা হুহু করে উঠল। দিন পনেরো নানা ঝামেলায় স্যারের খোঁজ নেওয়া হয়নি। পরের দিন সকালেই চন্দনকে পাঠালাম ওঁর বাড়ি। এসে বলল স্যার ঠিকই আছেন। কেন যেন একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল স্যারের কোনোদিন কিছু হতেই পারে না। ২৯ নভেম্বর বিকেলে চন্দনের কাছে যখন শুনলাম স্যারের শরীরটা ভালো নেই, তখন চিন্তিত হলেও ভেবেছিলাম তেমন কিছু নয়। কৃষ্ণনগর নার্সিংহোম থেকে কলকাতা রেফার করার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে রাজি হলেন। নার্সিংহোমের দোতলা থেকে একাই হেঁটে নামলেন। অ্যাম্বুলেন্সে ওঠানোর সময় অনেক অনুরোধ করে স্ট্রেচারে তুলতে হল। যাত্রাপথে বাম্পার এর ঝাঁকুনি অনুভব করে কোন স্টেশন আসছে বলতে-বলতে গেছেন। এমনকি 'বিরহী'-তে চা খাবার আবদারও করেন। কিন্তু স্যালাইন চালু থাকায় চা খাওয়ানো হয়নি। ১৪ ডিসেম্বর রাতে চন্দনের ফোনে নিবেদিতা কাকিমার "তোমার স্যার চরম অসুস্থ" মেসেজ পেয়েও ভাবছিলাম কিছু একটা মিরাকল ঘটবে। কিন্তু ১৫ ডিসেম্বর সাড়ে চারটে নাগাদ

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে যখন চন্দন ফোন করে বলল, "স্যার চলে গেলেন", তখন মাথাটা কোনো কাজ করছিল না। 'স্যার চলে গেলেন'— এই তিন শব্দের বাঁধনে আটকা পড়ে রইলাম। একটু পরে এক সাংবাদিক বন্ধু ফোন করে স্যারের সম্বন্ধে জানতে চাইল। আমি কিছুই তাঁকে বলতে পারলাম না। আমার কোনো কথাই সেদিন মনে পড়ল না। সারা ফেসবুক জুড়ে তাঁর ছবি। কতজন তাঁর সাথে তোলা ছবি পোস্ট করে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছে, আর আমি! স্যারের সাথে আলাদা করে যে ছবি তুলতে হবে, সেই কথাটাই কোনোদিন মাথায় আসেনি। কত-কত স্মৃতি মনে রয়ে গেল। একসাথে গোরভাঙা, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কলকাতা যাওয়া, কত অনুষ্ঠান, কত টুকরো টুকরো মজার ঘটনা। সব আছে, সব আছে, থাকবে। আমার স্যার আমারই থাকুন, কেউ যেন না-দেখে তাঁকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের বিজয়া সম্মেলনে সুধীর চক্রবর্তী

নন্দিনী নাগ

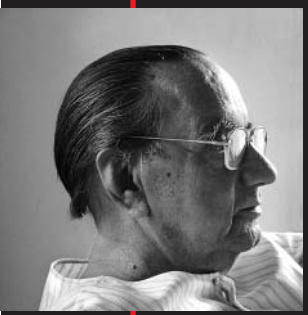

যেমন দেখেছি তাঁকে

কী অদ্ভুত সমাপতন! সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ স্মরণ সংখ্যার জন্য আমার একটি লেখা পত্রিকা সম্পাদকের কাছে জমা দিয়ে ফিরে আসার পথেই খবরটা পেলাম, তিনি আর নেই! প্রিয় বন্ধু পুলুর সাথে মিলিত হতে পাড়ি দিয়েছেন আমাদের সবাইকে ছেড়ে, একাকী নির্জন পথ ধরে।

আমার মনে পড়ে গেছিল আটবছর আগের সেই দিনটির কথা, যেদিন এই দুই স্বনামধন্য মানুষকে গভীর অন্তরঙ্গতায় গল্পে মগ্ন হয়ে যেতে দেখেছিলাম। সেদিন

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ

বিড়লা সভাঘরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান ছিল। ওঁরা দুই বন্ধু উপস্থিত হয়ে গেছেন একদম সঠিক সময়ে। আর আমিও হাজির, কারণ আমার ওপর ছিল অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করার দায়িত্ব। এদিকে সেদিন দুপুর থেকেই কলকাতায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, রাস্তাগুলোতে হাঁটু পর্যন্ত জল দাঁড়িয়ে গেছে। সেই দুর্যোগ কিন্তু ঘড়ির কাঁটা একচুল এদিক-ওদিক হতে দেয়নি সাতাত্তর বছর বয়সি দুই তরুণের। তবে প্রেক্ষাগৃহ দর্শকশূন্য, তাই নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান শুরু করা সম্ভব হলনা। সেই সুযোগে দুই বন্ধু গল্প জুড়লেন উইংসের পাশে বসে, আর আমি নির্বাক শ্রোতা। সেই গল্পের শেকড়বাকড় ছড়াল নানাদিকে, তাতে রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ার বিষয়টিও বাদ গেল না।

এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সেরে দুই বন্ধু আবার ফিরে গেলেন গ্রিনরুমে, ঠিক একমাসের ব্যবধানে একই তারিখে, আর এখন থেকে আবার তাঁরা উইংসের পাশে বসে গল্প করতে থাকবেন, কারণ আর তো কোথাও যাবার তাড়া নেই!

সুধীর চক্রবর্তীকে মানুষ নানাভাবে চেনেন। কারো কাছে তিনি সুশিক্ষক, কেউ বা চেনেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক-লেখক হিসাবে। এইসব পরিচিতি পেরিয়ে আমি যে সুধীর চক্রবর্তীকে চিনেছি, তিনি একজন স্নেহময় মানুষ। দীর্ঘদেহী মানুষটা বটগাছের মতো ডালপালা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন অনেককেই, তাঁর স্নেহাশ্রিতের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

ঠিক কী কারণবশত সুধীর চক্রবর্তী আমাকে স্নেহ করতেন বা খানিকটা প্রশ্রয়ও দিতেন, সেটা আমার সঠিকভাবে জানা নেই,

তবে নিশ্চয়ই তা আমার যৎকিঞ্চিত লেখালিখি করার প্রচেষ্টার জন্য নয়!

স্যরের ছোটো মেয়ে শ্রেয়াদি আর আমি একই স্কুলে পড়তাম। শ্রেয়াদি আমার চাইতে একক্লাস উঁচুতে পড়লেও রোজই প্রায় টিফিন পিরিয়ডে আমাদের গল্প হত। জেঠিমা প্রায়ই বলেন, সেইসময় থেকেই উনি আমাকে জানেন, যদিও তখনও শ্রেয়াদির বাবা-মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত মানুষ, তাঁকে দূর থেকে দেখাই শ্রেয় মনে করতাম আমি, তাই কাছাকাছি যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতাম না।

কিন্তু তাঁর সম্মুখীন আমাকে শেষ পর্যন্ত হতেই হল, আর ডেকে পাঠালেন তিনি নিজেই।

তখন আমি একটু একটু লিখি। ২০০১ থেকে নিয়মিত 'দৈনন্দিন গল্পের অল্পপত্র পরিধি' নামে একটি ত্রৈমাসিক গল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হত, যার সম্পাদক ছিলেন সৌম্যদীপ। 'পরিধি'র আমি একজন নিয়মিত গল্পকার হয়ে উঠেছিলাম সম্পাদক মশাইয়ের ঠেলাগুঁতোর গুণে, তার আগে আমার জানা ছিল না আমার লেখা গল্পগুলো পাঠকমহলে ভালোভাবে উৎরে যাবে! প্রসঙ্গত, এখনকার বেশ কয়েকজন সুপরিচিত লেখকের হাতেখড়ি হয়েছিল 'পরিধি'-তে। স্যর যে নিয়মিত 'পরিধি' পড়েন সেটা জানা ছিল না আর ওঁনার মত একজন পণ্ডিত এবং ব্যস্ত মানুষকে নিজের লেখাপত্র পড়তে দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার ছিল না। কিন্তু তবুও ডেকে পাঠালেন তিনি, আমার লেখা নিয়ে আলোচনা করলেন, সেই শুরু ওনার বাড়িতে যাওয়া। তবে বরাবরই আমি একটু গুটিয়ে থাকা মানুষ, কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন

খুব একটা যাইনি ওনার বাড়িতে, আমার মনে হত এতে ওঁর মূল্যবান সময় বরবাদ হয়। তবে জেঠিমা ভীষণভাবে যেতে বলতেন, আমার মেয়ের কথা শুনতে চাইতেন, মেয়েকেও দেখতে চাইতেন, তাই যেতে হত মাঝেমাঝে।

সেটা দু-হাজার আট বা নয়, তিনি তখন মেয়েদের কথাকল্প নামের একটি বই সম্পাদনা করার কাজে হাত দিয়েছেন আর 'পরিধি'-তে আমার লেখা পড়েই হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল, এই বইতে আমাকে দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখানো যায়। ফোনে লেখার বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে, তিনি আমাকে লেখাটা জমা দেবার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ বলে দিয়েছিলেন আর আমিও নানারকম প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সেই তারিখের মধ্যে লেখাটা শেষ করে ফেলেছিলাম। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, উনি যে-দিনটা বলেছেন, সেই দিনে গিয়েই লেখাটা দিয়ে আসব।

নির্দিষ্ট দিনের আগেরদিন আবার ফোন পেলাম, "তোমার লেখাটা আগামীকাল দেবার কথা"—লেখাটা সঠিক সময়েই দিয়েছিলাম সেদিন, আর আজও কিন্তু সেই শিক্ষা আমার মনে গেঁথে আছে, এখনো প্রতিটি জায়গাতেই নির্দিষ্ট সময়েই লেখা জমা দিই, একদিন আগে হলেও পরে তো কখনোই নয়।

কৃষ্ণনগর থেকে পাকাপাকিভাবে বসবাস গুটিয়ে চলে আসার পর এখনও প্রতিবছরই দু-বার করে অন্তত ওখানে যাই আর গেলেই স্যরের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়া ছিল অবশ্যকর্তব্য। কোনোবার হয়তো গিয়ে তখনও দেখা করতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, অথচ উনি লোকমুখে জানতে পেরেছেন আমার যাবার কথা, পরিচিত জনের কাছে

বলেছেন, "নন্দিনী এসেছে শুনলাম, কই আমার কাছে এল না তো এখনো!"

সেই কথা শুনে পরদিনই ছুটেছি আমি, দেখেছি স্যর আর জেঠিমা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তারপর তিনজন মিলে অনেক গল্প হত, নানারকমের গল্প, বেশিরভাগটাই ব্যক্তিগত আর পারিবারিক কথাবার্তা, যার মধ্যে লেখাপড়ার কথা থাকত না বললেই চলে।

আর একটা ঘটনা কোনোদিন ভোলার নয়—

২০১৬, ডিসেম্বর মাস, কৃষ্ণনগরে গেছি বড়দিনের ছুটিতে। রবীন্দ্রভবনে নাটকের মেলা চলছে, দেখতে গেছি। রবীন্দ্রভবনে ঢোকার মুখেই স্যরের সঙ্গে দেখা, তখনও নাটক শুরু হতে খানিকটা দেরি আছে, তাই বাইরে গল্প করছেন। আমাকে দেখে প্রথম কথাটাই বললেন, "তুমি বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছ, সেটা আমাকে অন্য লোকের কাছে জানতে হল!" গলায় এক রাশ অভিমান।

আসলে আমি তখনও হাতে চিঠি পাইনি, কেবল টেলিফোনে জেনেছি, তাই কাউকেই বলিনি কথাটা, কিন্তু কী করে যেন খবরটা ওঁর কানে পৌঁছে গেছিল। পরে আমার মনে হয়েছিল, আমারই ভুল হয়েছে, টেলিফোনে পাওয়া সংবাদটাও ওঁকে জানানো উচিত ছিল। আসলে উনি যে আমাকে নিয়েও ভাবেন, সেটা আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি।

তারপরও আর একবার ঘটেছে এমন ব্যাপার। নতুন বই বেরিয়েছে আমার, কিন্তু আমি কৃষ্ণনগরে থাকায় তখনও হাতে পাইনি, কিন্তু উনি ঠিকই খবর পেয়ে গেছেন। আবার রবীন্দ্রভবনে

দেখা একটা অনুষ্ঠানে, প্রথমেই নালিশ, "নতুন বই বেরিয়েছে, আমাকে দিলে না তো!" বুঝিয়ে বললাম আমার অপারগতার কারণ। এবার আর অভিমান করেননি, বাড়িতে যাবার কথা বললেন বারবার করে।

পরে বুঝেছি, উনি আমাকে যথেষ্টই স্নেহ করতেন, তাই এমন চাওয়া-পাওয়া। জেঠিমা সবসময়ই বলেন, "তুমি আমার আর একটা মেয়ে।" স্যর শুনে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মিটিমিটি হাসতেন, কিন্তু মুখে কিছু বলেননি কখনও। তাঁর অন্তরে মমতা ছিল প্রচুর কিন্তু সেই আবেগের প্রকাশ ছিল না বিশেষ।

বেশিরভাগ দিনই গিয়ে দেখতাম, স্যর ঢোলা পাজামা আর হাফহাতা গেঞ্জি পরে খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে কিছু পড়ছেন বা লিখছেন, বিছানার একপাশে বেশ কিছু নতুন বই রাখা, নতুন লেখকরা দিয়ে গেছেন। আমার মনে হয় উনি কিন্তু সকলের লেখাই মন দিয়ে পড়তেন, যদিও এসব নিয়ে আমি কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

আমি প্রথম প্রথম ফোনে জানিয়ে যেতাম, পরের দিকে জেনে গেছিলাম কখন গেলে স্যরকে পাওয়া যায়, তাই আর ফোন না করেই সরাসরি চলে যেতাম। আমি গেলে উনি বইপত্র রেখে সোজা হয়ে বসতেন, জেঠিমাকেও ডেকে নিতেন পাশের ঘর থেকে। তারপর তিনজনের গল্পে গল্পে ঘড়িও দৌড়োতো। সেইসব গল্পগাছার বেশিরভাগটাই পারিবারিক।

স্যর খুব খেতে ভালোবাসতেন, বিশেষ করে মিষ্টি। তাই আমি প্রতিবারই বিজয় ময়রার পান্তুয়া নিয়ে যেতাম, জানতাম এটা উনি ভালোবাসেন। কয়েকবছর আগে তেমনই নিয়ে

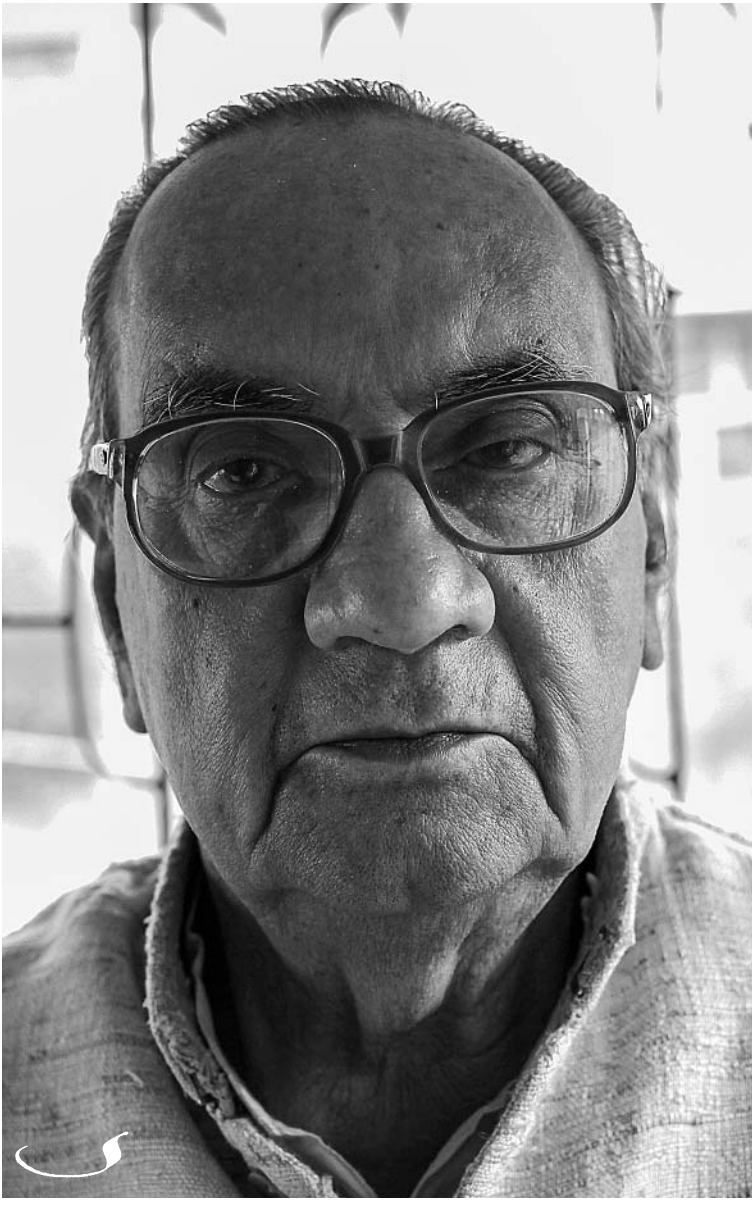

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ

গিয়েছি, জেঠিমা বললেন, "তোমাদের স্যর আর মিষ্টি খেতে পারছেন না, অ্যাসিড হচ্ছে খুব"।যরের সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম গলার স্বর একদম বসে গেছে, কথা শোনাই যাচ্ছে না। বললেন কিছুদিন হল এই সমস্যাটা হয়েছে, চিকিৎসায় কোনো ফল হয়নি। ভীষণ খারাপ লাগল। অমন সুবক্তা মানুষটার গলার স্বর বসে গেলে, কথা বলায় পরিমিতি আনতে বাধ্য হলে, সেটা কষ্টের কারণ তো উভয়পক্ষেরই।

আমার আবার একটু আধটু ডাক্তারিবিদ্যে ফলানো অভ্যেস আছে, টুকে পাশ করা না হলেও শুনে পাশ করা ডাক্তার। রোগনির্ণয় নিদেনপক্ষে কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত সে ব্যাপারে অনেকেই আমার পরামর্শ নিয়ে থাকে, আর 'কমন' পড়ে গেলে দাওয়াই ও বাতলে দিই। সেবারও স্যরের উপসর্গ 'কমন' এসে গেছিল। সেই আত্মবিশ্বাসে ওঁকে জানালাম দমদমের একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কথা, এবং স্বরের সমস্যাটা যে অ্যাসিডের জন্যই হচ্ছে সেটাও বিশ্বাস করিয়ে ফেললাম। আমার পরিচিত একজন ঠিক এই স্বর বসে যাওয়ার সমস্যায় ভেলোর ফেরত, (উৎকর্ষে ডাক্তার বিলাত ফেরত এবং জটিলতায় রোগী ভেলোর ফেরত, এটাই বঙ্গদেশের বিশ্বাস) শেষপর্যন্ত তার সমস্যা নির্ণয় এবং নিরাময় করেছিলেন এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক।

স্যর সবটা শুনে আমাকে বলেছিলেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিতে, উনি গাড়িভাড়া করে দমদমে যাওয়া আসা করে বেশ কিছুদিন চিকিৎসাও করিয়েছিলেন। তবে ওনার ক্ষেত্রে খুব একটা ফলদায়ক হয়নি সেই চিকিৎসা, আর সেটা বড্ড বেশি ব্যয়বহুল

হয়ে যাচ্ছিল। স্যর হাসতে হাসতে বলেছিলেন আমাকে, 'ওষুধগুলোর বড্ড দাম!'

এই সমস্যাটা কিছুদিন পরে অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছিল, কিন্তু আমি আর কখনোই মিষ্টি নিয়ে যেতাম না, মরশুমি ফল নিয়ে যেতাম পরিবর্তে। মনে পড়ছে, একবার তালশাঁস নিয়ে গেছিলাম, উনি খুব খুশি হয়েছিলেন। বাড়ির কাজে সাহায্য করেন যে মহিলা, তাকে তখনি তালশাঁস ছাড়িয়ে দিতে বললেন। আর একবার লিচু আর আম নিয়ে যাওয়াতেও খুব খুশি হয়েছিলেন। জেঠিমা বলেছিলেন ওটাই সেইবছরের প্রথম লিচু, আম। বলাই বাহুল্য, ওনার খুশি দেখে আমিও খুব খুশি হয়েছিলাম।

তবে স্যরের স্নেহধন্য এবং আশীষপ্রাপ্ত মানুষের তালিকাটা খুব একটা ছোটোো নয়, তাই স্যরের সঙ্গে অতিবাহিত করা এরকম স্মৃতি অনেকেরই আছে, এর থেকে অনেক বেশিই আছে, তাই এইসব কথা আর বাড়াব না।

কিন্তু এইসবকে অতিক্রম করে, অদৃশ্য এক যোগসূত্র আমাদের মধ্যে ছিল, যাকে অনেকে বলেন অদৃষ্ট। হয়ত সেই টানেই উনি বারবার আমার সাথে কথা বলতে চাইতেন,আসলে এমন কিছু বিষয় আছে যা সবার সাথে ভাগ করে নেওয়া যায় না। কেবল মরমীই বোঝে সেই মরমের কথা। সেই কথাই এখন বলব।

সুধীর চক্রবর্তী মানুষের কাছে পরিচিত একজন গবেষক, প্রাবন্ধিক, সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, সুবক্তা, সুপণ্ডিত, সুরসিক এবং সুলেখক হিসাবে। তাঁর কাজের ক্ষেত্রগুলি তাঁকে প্রভূত সম্মান এনে দিয়েছে। লেখক হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন সাহিত্য

আকাদেমি পুরষ্কারে, শিক্ষক হিসাবেও তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়। কিন্তু এই বিরাট কর্মজগতের বাইরে, অন্তরমহলে তিনি বহন করতেন ব্যথার গুরুভার, প্রতিমুহূর্তে বিদ্ধ হতেন সেই যন্ত্রণায়। এমন এক কষ্টের উৎস, যা তাঁকে প্রত্যহ পেছনের দিকে টানত, নিয়ন্ত্রণ করত তাঁর গতিবিধি, ইচ্ছে থাকলেও অনেক জায়গায় যেতে পারতেন না, করতে পারতেন না অনেক কিছু, যা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল। যে কারণে এতকিছু পেয়েও শান্তি পাননি তিনি, অথচ তাঁর হাসিমাখা মুখ তা কখনো প্রকাশিতও হতে দেয়নি। এই জায়গায় আমরা সমব্যথী, তাই বোধহয় আমার সাথে কথা বলতে ভালো লাগত তাঁর।

প্রথম সন্তানের জন্ম সবমানুষের কাছেই একটা বিশেষ আনন্দদায়ক অনুভূতি। একটা পুতুলকে একটু একটু করে মানুষে রূপান্তরিত হতে দেখা সত্যিই রোমাঞ্চকর। স্যরের প্রথম কন্যাসন্তান যখন ছোটোটো ছোটোটো পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে বাড়িময়, যখন সবে আধোআধো বুলি ফুটছে সেই পরীর মুখে, তখনই দুরারোগ্য এক ব্যধিতে আক্রান্ত হল হল সে। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখেননি স্যর,আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগে আমেরিকা থেকেও ওষুধ আনাতেন,যদি হৃদয়ের টুকরো মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সমস্ত চিকিৎসার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে একটু একটু করে চোখের সামনে জড়পিণ্ডবৎ হয়ে পড়ল সেই ফুটফুটে শিশুটি। কোনোরকম নড়াচড়া করতে অক্ষম, ভাবপ্রকাশে অক্ষম, সদ্যোজাত শিশুর চাইতেও অসহায় সেই সন্তান কেবল তার প্রাণটুকু নিয়েই বেঁচে আছে।

আমার একমাত্র কন্যাসন্তানও সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত, এই জায়গাটাতে আমরা প্রকৃত সহমর্মী।

স্যর এবং জেঠিমা তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার মেয়ের কথা জানতে চাইতেন, কতটা কি শিখতে পেরেছে, সারাদিন কিভাবে কাটায় ও, সেইসব কথা শুনতে চাইতেন। মেয়েকে নিয়ে আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত সংগ্রাম, আমার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই ওঁদের আকৃষ্ট করত। নিজের মেয়ের কথাও বলতেন, যে কথা সচরাচর অন্যদের সাথে আলোচনা করতেন না। খুব বেশি কেউ স্যরের এই নরম জায়গাটার কথা জানে না, জানিয়ে লাভ তো কিছু নেই, কেবল বারবার রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া।

এই মেয়ের জন্যই স্যর যেখানেই যেতেন, যতই কষ্ট হোক না কেন রাতে বাড়িতে ফিরে আসতেন, কৃষ্ণনগরে থাকলেও রাত আটটার মধ্যেই বাড়িতে ফিরতেন, মেয়েকে দেখাশোনা করার জন্য সারাদিন বাড়িতে থাকতেন যে মহিলা, তিনি চলে যাবার পর মেয়ের দায়িত্ব স্যর নিজে নিতেন।

নানা কাজে প্রায়ই কলকাতা যেতে হত স্যরকে, বেশ ভোরের ট্রেনেই যেতেন। এমনই একবার যাবার কথা ছিল, শীতকাল ছিল সেটা। সেদিন মাঝরাতে কোনোকারণে ঘুম ভেঙে গেছিল ওঁর, উনি তখন একবার মেয়ের ঘরে দেখে আসতে গেছিলেন, মেয়ের গায়ের ঢাকা ঠিকঠাক আছে কিনা, ও ঠিকমতো ঘুমিয়ে আছে কিনা। গিয়ে দেখেছিলেন, হিসিতে জামাকাপড় ভিজিয়ে, শীতে কুঁকড়ে শুয়ে আছে মেয়ে, গায়ে ঢাকাও নেই। সন্তানের সেই কষ্ট তাঁকে আর বাকি রাতটুকু দুচোখের পাতা এক করতে দেয়নি, মেয়েকে পোশাক বদলে শোওয়ানোর পর বাকি রাতটুকু ওর

কাছে বসেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তাতে অবশ্য পরদিন তাঁর রুটিনমাফিক কাজে এতটুকু ছন্দপতন হয়নি। ঠিক সময়েই ট্রেন ধরেছিলেন, গন্তব্যে পৌঁছেছিলেন এবং নিজের সবটা দিয়েই কাজও করেছিলেন। এবং আমি নিশ্চিত, তাঁকে দেখে সেদিন কেউ বুঝতেও পারেনি তাঁর মনের মধ্যে কতটা কষ্ট জমে আছে।

অনেকেই মনে করেন, তিনি তাঁর খ্যাতি এবং কাজ নিয়েই ব্যস্ত আর খুশি, অসুস্থ কন্যাটি সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু আমি জানি তিনি তেমন ছিলেন না। নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারি, লেখা গবেষণা ইত্যাদি কাজে ডুবে থাকাটা আসলে তাঁকে শক্তি যোগায়, শারিরীক এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকার শক্তি, যে শক্তিটা না থাকলে কিভাবে যাপন করবেন দীর্ঘজীবন আর কিভাবেই বা রক্ষা করবেন শিশুর মতো অসহায় সন্তানটিকে!

কেবল নিজের মেয়ের জন্যই নয়, অন্যদের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সন্তানদের জন্যও তিনি যথেষ্ট উদ্বেগ পোষণ করতেন। তাই যখন আমরা কয়েকজন বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানের বাবা-মায়েরা মিলে কৃষ্ণনগরে এই বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল (থেরাপি সেন্টার) তৈরি করলাম তখন তিনি আমাদের মানসিকভাবে সাহস যুগিয়েছিলেন, অর্থ দিয়ে সাহায্য করা ছাড়াও স্কুলটি উদ্বোধনের দিন নিজেও এসেছিলেন।

স্যারের সঙ্গে দেখা হলেই আমাদের সন্তানদের প্রসঙ্গ উঠতই। কিন্তু স্যর কিংবা জেঠিমা কিন্তু কখনোই তাঁদের মনোবেদনা বা দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ করতেন না। বরং আমার জন্য, শৈবালদার (স্যরের অন্যতম প্রিয় ছাত্র, তাঁর ছেলেটি অটিজম-এ আক্রান্ত) জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা দেখতে পেতাম। এইসব প্রতিবন্ধকতা সঙ্গে

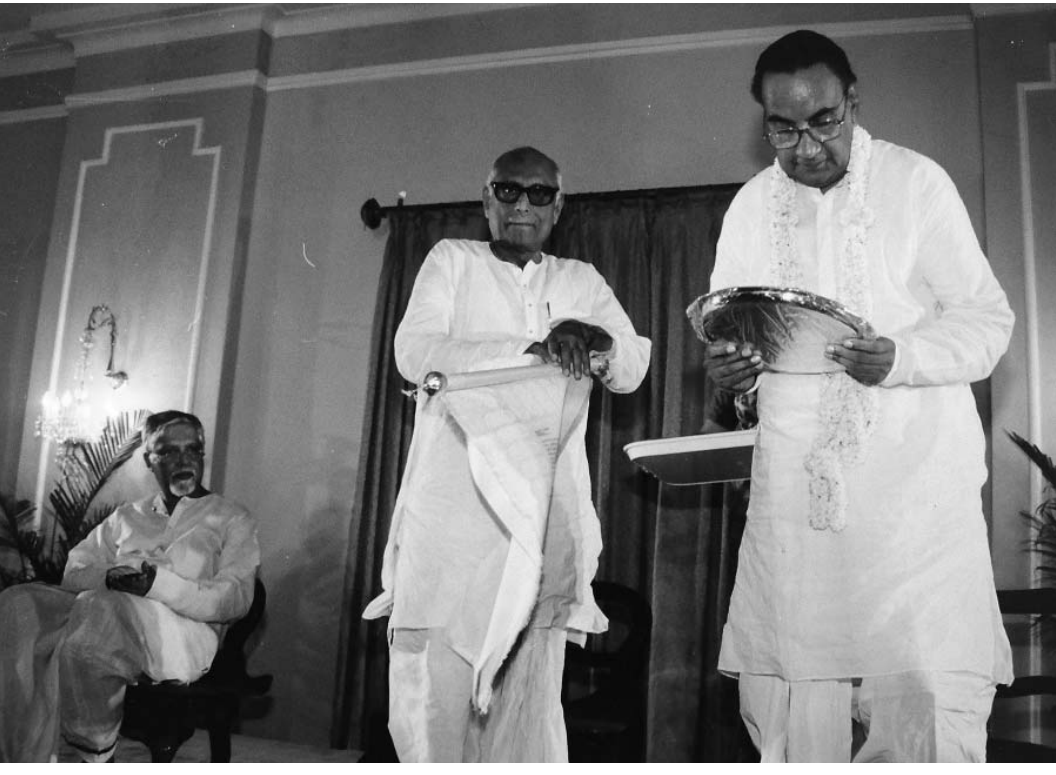

আনন্দ পুরস্কার গ্রহণকালে

নিয়েও আমি যে গবেষণার কাজ শেষ করেছি, লেখালিখি করছি তারজন্য আমাকে সবসময় প্রশংসা করতেন আর আমার কলেজে পড়ানো উচিত ছিল সেটাও বলতেন। তখন তাঁকে দেখেছি স্নেহশীল পিতার ভূমিকায়।

স্যর অবশ্য বেশি কথার মানুষ ছিলেন না, কিন্তু জেঠিমা বলে ফেলতেন সব। বাবা মায়ের মতোই ওঁরা দুজনে মিলে শৈবালদা আর আমাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন দ্বিতীয় আর একটি সন্তানের কথা ভাবতে, যাতে অসহায় এই বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য ভবিষ্যতে নিজের কেউ থাকে। বলাইবাহুল্য শৈবালদা বা আমি কেউই সেই পরামর্শ শুনিনি। আমি তো আবার উল্টে প্রতিবার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে আসতাম, 'ভাইবোন থাকলেই যে দেখাশোনা করবে সে নিশ্চয়তা কোথায়! আমাদের অবর্তমানে হোমে থাকার ব্যবস্থা করব।'

আমার এই কথা বারবার শুনতে শুনতেই কিনা জানি না, মেয়ের জন্য হোমের ভাবনা উনিও একবার ভেবেছিলেন। কয়েকবছর আগে আমাকে বলেছিলেন খোঁজখবর করতে। আর সেটা কথার কথা ছিল না, আমাকে বারবার করে বলে দিয়েছিলেন যেন কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করি আমি। তবে সেই ভাবনা শেষ অবধি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি, কারণ অনেক খুঁজে কলকাতায় যে হোমটাতে আমি কথাবার্তা চালিয়েছিলাম, সেটার টাকার চাহিদা ছিল বড়ই বেশি, তাছাড়া ওদের ব্যবস্থাপনাও আমার পছন্দ হয়নি।

শ্রেয়াদির দুই ছেলেমেয়ে, স্যরের আদরের নাতি আর নাতনিও ছিল তাঁর প্রাণ। ক্লাস সেভেনে পড়াকালীন যে ছাত্র

মডেল বানানোর প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের জন্য নাসায় যাওয়ার সুযোগ অর্জন করেছিল, পরবর্তীতে সে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে ইতিহাসে। দাদুর ধারায় প্রভাবিত নাতিটি ইতিহাসকেই বেছে নিয়েছে নিজের পড়ার বিষয় হিসাবে আর মুম্বাইয়ের পাট চুকিয়ে একাদশ-দ্বাদশের পড়াশোনা সে দাদু-দিদার কাছে থেকেই করছে। স্যর আর জ্যেঠিমার কাছ থেকেই শোনা, ইতিহাস গবেষণায় তার বিশেষ আগ্রহ। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সেও ভবিষ্যতে সুপণ্ডিত এবং গবেষক-লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পাবে, দাদুর পরম্পরা বহন করবে।

একান্ত নিজেরটি ছাড়াও সম্পর্কসূত্রের নাতিকেও আসতে দেখেছি তাঁর কাছে, পারিবারিক সম্পর্কগুলোর প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষ যত্নবান।

আর দুটো কথা বলে এই স্মৃতিচারণে ইতি টানব।

স্যরের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল এইবছরের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে। অমন সুস্থ মানুষটার সঙ্গে যে আর কোনোদিন দেখা হবে না, ভাবতেই পারিনি আমি। সেদিন আমার গোয়েন্দা কাহিনী হত্যার পরিমিতি পড়ে তাঁর মুগ্ধতার কথা জানিয়েছিলেন। যেভাবে লাইন ধরে ধরে বলছিলেন তাতে বুঝতে পেরেছিলাম যে বইটা খুঁটিয়ে পড়েছেন তিনি। এখনকার সাইবার দুনিয়ার পটভুমিতে লেখা পড়ে তিনি যে রসাস্বাদন করেছিলেন তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না, শরীরের বয়স পঁচাশি হলেও মনটা তাঁর একদম তরুণ। তারপর তিনি আমার কাছে আরও একটা বই চেয়ে নিলেন, যেটা তাঁকে আমি মার্চ মাসে দিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু সেইদিনই কেউ একজন তাঁর বাড়ি থেকে

বইটি লুকিয়ে নিয়ে গেছিল। স্যর বলেছিলেন, বইটি কে নিয়ে গেছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে তাকে কিছু বলতে পারছেন না। কেউ তার লেখা বই চুরি করে নিয়ে যায় শুনলে লেখকের আনন্দই হয়, আমারও হয়েছিল। আমার সঙ্গে অনন্ত সন্ধান ছিল এক কপি, দিয়ে দিলাম। বইটা পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন উনি, বলেছিলেন 'আমার নাম লিখে দাও, স্যর আর জ্যেঠিমা তো যে কেউই হতে পারে।' তাই দিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন পড়ে মতামত জানাবেন, কিন্তু আমার আর সেটা জানার সৌভাগ্য হল না।

এই শেষবার দেখা করার সময় তিনি আমাকে তাঁর শত শত গীত মুখরিত বইটি উপহার দিয়েছিলেন। এর আগে তাঁর সম্পাদিত 'ধ্রুবপদ' দিয়েছিলেন অনেকগুলো, কিন্তু সহস্তে লিখে স্বরচিত বই দেওয়া এই প্রথম। জানি না তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিনা, এটাই শেষ সাক্ষাৎ!

তিনি আমার কাছে আর একটা জিনিস চেয়েছিলেন, যেটা আমি দিতে পারিনি। আমি বুঝতেই পারিনি হাতে এত কম সময় আছে, তাহলে অবশ্যই তাড়াহুড়ো করে যোগাড় করতাম, দিয়ে আসতাম।

জুলাইয়ে কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে আসার পর সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ আমাকে ফোন করেছিলেন স্যর। 'সৃষ্টির একুশশতক' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক লেখা বের হয় যার নাম 'ঠিকানা খাট'। লেখক নিত্যপ্রিয় ঘোষ, স্যরের সহপাঠী ছিলেন। সেদিন নিত্যপ্রিয় ঘোষের সঙ্গে দুপুরে ফোনে দীর্ঘ আলাপচারিতা হয় স্যরের, উঠে আসে নানা পুরনো কথা, তারই ফলশ্রুতিতে

সন্ধ্যাবেলা আমাকে ফোন করেন। যেহেতু ‘একুশ শতক’-এ আমি প্রায়ই যাই, তাই আমাকে বলেছিলেন, ধারাবাহিকটির সবগুলি কিস্তি যোগাড় করে দিতে। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম দেবার। আমি চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু তখন যেহেতু সকলে উৎসব সংখ্যা প্রকাশ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন আর কোভিডের কারণে আমিও পত্রিকা দপ্তরে যাওয়া হচ্ছিল না, তাই কাজটা করে উঠতে পারিনি। এই মনোবেদনা আমার থেকে যাবে চিরদিন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চলে যাবার পর অত্যন্ত ভেঙে গেছিল তাঁর মন। তাই বন্ধুর স্মৃতিচারণ করে কিছু লেখার জন্য ‘একুশ শতক’-এর পক্ষ থেকে সুমনদা (ভট্টাচার্য) যখন তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, “আমি আর লিখব না”। উত্তরটা শুনে তখন মনে হয়েছিল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তিনি ‘দেশ’-এ লিখেছেন, এ নিয়ে আর কোথাও লিখবেন না।

হয়তো তিনি নিজে বুঝেছিলেন, কিন্তু আর কেউই ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে এই কথার অর্থ হল, তাঁর চিরসচল কলম থামতে চলেছে চিরদিনের জন্য, আর কোনোদিনই কিছু লিখবেন না তিনি।

সুবীর সিংহরায়

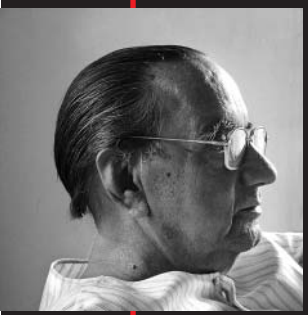

আমাদের কৈশোরের আচার্য

তখন আমি দশম কি একাদশ শ্রেণিতে পড়ি। সালটা উনিশশো আটষট্টি। সত্যেনদার আলেখ্য ফটো স্টুডিওয় বিদগ্ধজনের আড্ডায় একটু-আধটু যাতায়াত করছি। আড্ডাপতি করুণা ভট্টাচার্যকে ঘিরে সে-আড্ডা তখন তারকার আলোকচ্ছটায় ভাস্বর। সেই তারকা সমাবেশের মধ্যেও শুকতারার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়িয়ে বিদ্যমান এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব—অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী। আপামর কৃষ্ণনগরবাসীর কাছে যিনি 'স্যার' নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর বহুদর্শিতা, পাণ্ডিত্য এবং সর্বোপরি তাঁর

কাঠিবনে আচার্যের আলোকচিত্রের সামনে

বাকপটুতায় শ্রোতারা বিমুগ্ধ। গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যেও অনাবিল রসিকতার মিশেলে তাঁর বাচনশৈলী অনায়াসে অনন্যতা ছুঁয়ে দিত।

সেসময় আমার বয়স ষোলো কি সতেরো। জ্ঞানগম্যি-অভিজ্ঞতায় আর অবশ্যই বয়সের নিরিখে দুস্তর ব্যবধান। স্বভাবতই সে-কারণে আড্ডাবাজদের সঙ্গে সসম্ভ্রম দূরত্ব রেখে মিশতাম। কিন্তু সে-ব্যবধান ধোপে টিকল না। এইসব আপাত গেরামভারি মানুষগুলো তাঁদের সরল আন্তরিকতায় কখন যে আমার মতো অর্বাচীনকে আপন করে নিলেন তা বুঝতেই পারিনি। ফলে করুণা ভট্টাচার্য হয়ে উঠলেন করুণাদা। আপাত-রুক্ষ সত্যেন মণ্ডল হলেন সত্যেনদা। এমনি করে পৃথ্বীশবাবু—পিন্দা, নির্মল সান্যাল—নিমুদা আর অধ্যাপক সুধীর চক্কোত্তি হয়ে গেলেন আমার ভালোদা। তাঁর পোশাকি নামটি ছিল অধ্যাপক ডক্টর সুধীরপ্রসাদ চক্রবর্তী, কলেজে এস.পি.সি। কিন্তু আমার ভালোদা গয়নাগাটি পছন্দ করতেন না আদপেই। বস্তুত নামের আগে অধ্যাপক বা ডক্টর ওসব তকমা কোনোদিনই ব্যবহার করতে দেখিনি তাঁকে। বরং বাহুল্যজ্ঞানে 'প্রসাদ' থেকেও নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রেখেছিলেন। জীবনভর সাদামাঠা সুধীর চক্রবর্তী হয়ে থাকার মধ্যেই ছিল তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য। আসলে মানুষটাই ছিলেন খোলামেলা, অকপট। একবার আলেখ্য-র আড্ডা নিয়ে লিখতে গিয়ে তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির প্রসঙ্গে একজায়গায় লিখেছিলাম— অধ্যাপক - "ডক্টর খুইয়ে এখন তিনি শিরোমণি সুধীর প্রসাদ, পরে প্রসাদ ঘুচিয়ে শিরোমণি সুধীরানন্দ হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি শিরোমণি সুধীরানন্দ এ্যাঃ (একাডেমি) হলেন।

এবার কবে তিনি 'জ্ঞাঃ' (জ্ঞানপীঠ) হবেন এঁজ্ঞে? সে সম্ভাবনায় আড্ডাবাজরা উদগ্রীব!" লেখাটা পড়ে খুব-খানিক হেসে বলেছিলেন, "ছোটোভাই, তুমি কি আমাকে খেতাব চাপা দিয়ে মারতে চাও নাকি?"

যে-কোনো রসিকতা, তা সে নিজের সম্পর্কে হলেও সানন্দে গ্রহণ করার বিরল ঔদার্য তাঁর ছিল। পালটা রসিকতাতেও ছিলেন সিদ্ধবাক। একবার আড্ডার মধ্যে আমি বাউলসঙ্গ আর দেহতত্ত্ব নিয়ে একটা ছোটোখাটো লেকচার দিয়ে ফেলায় (কী আস্পদ্দা ভাবুন!) গম্ভীর হয়ে ভালোদা বলে উঠলেন, "দেখেছেন করুণাদা, ছোটোভাই-এর কত্তো জ্ঞান, কিন্তু একটুও অহংকার নেই!" আমি তো এই কাঠির ঘায়ে চুপ। আমার পদবি নিয়েও মজা করতে ছাড়তেন না। মাঝে-মাঝে আমাকে সিংহশাবক বলে সম্বোধনই শুধু করতেন না, বলতেন, "তোমরা রাজপুত না ওজপুত, ছেত্রী— চিরকাল বামুনদের দারোয়ানি করেছ।" আমি নদিয়ার গ্রামের ভাষা ধার করে বলতাম, "ঠিক বইলেচো, তুমাদের দুক্কু দেকে চোকে জল আসে। য্যাকুনি বিপদে পড়িচো, ত্যাকুনি জোড়হাতে বইলেচো— হে আম অখখে করো, হে কেষ্ণ অখখে করো। আমরাই তো চেরডাকাল তুমাদের অখখে করিচি।"

উনিই-বা কম যান কীসে? আমার ভাষাতেই উত্তর করেছেন, "মুকে মুকে কতা! তু তো এন্ধারা ছিলিনি, তু এন্ধারা হলি ক্যানে?"

ভালোদার সঙ্গে এমনই রসে-বশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমার। নিজের অধিষ্ঠান থেকে নেমে এসে আমাদের মতো অপগণ্ডদের সঙ্গে সহজভাবে মেশার বিরল গুণের অধিকারী

ছিলেন তিনি। অনেক সময় আমরা আলেখ্য-র সামনের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসতাম। তেমনই একদিনের ঘটনার কথা বলি। ভালোদার ভাষায় তখন আমার অনুরাগের বয়েস। আমরা গল্প করছি। এমন সময় ডানদিকের রাস্তা ধরে এক অপরূপ সুন্দরী কিশোরীকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি তো যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! তার গমনছন্দের সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘাড়ও ঘুরতে লাগল। যখন সে বাঁ-দিকে ঘুরে গেল তখনও আমার চোখ তাকে অনুসরণ করে চলেছে। হঠাৎ কানে এলো ভালোদার সরস উক্তি, "কী হল ছোটোভাই, গুণ টেনে নিয়ে গেল নাকি!" উদাস গলায় বললাম, "কী করব বলো, পালে যে বাতাস নেই।"

সত্যেনদা আলেখ্য-র ঠেকের একটা পোশাকি নাম দিয়েছিলেন — 'মেধা-চর্চা কেন্দ্র'। বড্ড ভারী আর গুরুগম্ভীর। তবু তার টানে দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষ কৃষ্ণনগরে এলে একবার অন্তত ছুঁয়ে যেতেন এই আড্ডা। এঁদের মূল আকর্ষণ ছিলেন অবশ্যই আমার ভালোদা। মেধাচর্চা হত বিলক্ষণ, আমরা ঋদ্ধও হতাম।

কবি জয় গোস্বামী তখনও কলকাতাবাসী হয়নি। প্রায়ই রানাঘাট থেকে ঠেকের টানে আলেখ্য-য় চলে আসত। অসাধারণ 'মিমিক্রি' করতে পারত জয়। হাসি-আনন্দে গুলজার হত আড্ডা। ভালোদাও খুব উপভোগ করতেন জয়ের 'মিমিক্রি'। কখনোসখনো দেবদাস আচার্য, সুবোধ সরকারেরা ঠেকে উপস্থিত হয়ে নানা রং ছড়িয়ে যেত। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আড্ডা-কাতর বাঙালিরা আলেখ্য-র ঠেকে এসে জুটতে লাগল। কবি প্রাণেশ সরকার, রামকৃষ্ণ দে, শ্যাম বিশ্বাস, শান্তি নাথ,

সঞ্জীব প্রামাণিক, সুবোধ দাশেরা এলো, এলো শিবনাথ চৌধুরী, ডাক্তার রমেন সরকার, কবি তপন ভট্টাচার্য, সুরসিক স্বদেশ রায়। মাথাভর্তি জটিল ভাবনা নিয়ে এলো সুচিন্তক বিভাস চক্রবর্তী। দক্ষ সংগঠক সম্পদ ধর, শংকর সান্যাল আর সুদক্ষ নাট্যকর্মী তুহিন দে, স্বপন (গোপাল) বিশ্বাসেরা একে-একে এসে জমে গেল ঠেকের নেশায়। এসময় ভালোদা আর বিভাস যুক্তি করে আড্ডায় চালু করে দিল— 'ক্রিং পুরস্কার'। যাদের মাথায় একটু উদ্ভট ভাবনা খেলা করে, কেষনগরের ভাষায় তাদেরই বলা হয়— 'ক্রিং'। নিজগুণে আপনারা মার্জনা করবেন আমাকে কেননা আমিই ছিলাম প্রথম ক্রিং পুরস্কার প্রাপক। আসলে সেবার যতগুলো পুজোসংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, প্রায় তার সব ক-টির আদ্যোপান্ত মায় বিজ্ঞাপন সমেত পড়ে ফেলেছিলাম আমি। ফলত বিরল 'ক্রিং পুরস্কার' লাভের সৌভাগ্য জুটেছিল আমার কপালে। একজন-সদস্যবিশিষ্ট 'ক্রিং পুরস্কার মনোনয়ন ও প্রদান কমিটির' সর্বেসর্বা ছিলেন আমার ভালোদা। সুলেখক সুবোধ দাশ দ্বিতীয় ক্রিং পুরস্কার প্রাপক। সুবোধ থাকত কেষনগরে কিন্তু তার ব্যাংক একাউন্ট ছিল কলকাতায়। সে-কারণে মাস-পয়লায় মাইনে পেয়েই সে কিনে ফেলত শিয়ালদার মাসিক টিকিট। কোনো কাজ না-থাকলেও মাঝেমাঝে ট্রেন ধরে সে চলে যেত শিয়ালদায়, আবার পরের ফিরতি ট্রেন ধরেই ফিরে আসত কেষনগরে। জিজ্ঞেস করলে বলত, "কলকাতাকে ছুঁয়ে এলাম। ট্রেনে চড়লে মনটা বেশ ভালো থাকে।" সুতরাং আবশ্যিক সুবোধ্য কারণেই সুবোধকে দ্বিতীয় ক্রিং পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন ভালোদা।

স্বদেশ একদিন ভরা আড্ডায় বলল, "ওসব মেধাচর্চা কেন্দ্র-টেন্দ্র নয়, বাজারে শুনলাম এ আড্ডার নাম— 'কাঠিবন'! এখানে নাকি কেউ কাউকে কাঠি করতে ছাড়ে না!" যদিও আমরা জানতাম 'কাঠিবন' নামকরণ আদতে স্বদেশের ঘোড়েল মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত, তবু সবাই মেনে নিয়েছিলাম। কেষনগরের ভাষায় কারুর পেছনে লাগাকেই 'কাঠিকরা' বলা হয়। সে-হিসেবে অবশ্য একদম লাগসই নামকরণ। কেননা এ আড্ডায় সুযোগ পেলে কেউ কাউকে কাঠি করতে ছাড়ে না। কাঠির চরিত্র বিচার করে এক-একজনের নামকরণও করা হয়। কেউ বাবলাকাঠি, কেউ খেজুরকাঠি, কেউ নিমকাঠি আবার কেউ-বা তেজপাতার কাঠি। আড্ডার সর্বাধিনায়ক আচার্য ভালোদা মাঝেমাঝেই কাউকে-না-কাউকে চিকনকাঠি করে দিতে ছাড়তেন না। কিমাশ্চর্যম! আড্ডার এই 'কাঠিবন' নামটাই শেষমেষ মান্যতা পেয়ে গেল। সময় গড়িয়ে গিয়েছে। আলেখ্য ছেড়ে আড্ডা উঠে এসেছে আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে। কিন্তু 'কাঠিবন' নামটা আড্ডার সঙ্গে লেপটে গিয়েছে ফেভিকলের মতো। স্বদেশের দুষ্টুমি ভরা মগজ থেকে উদ্ভট সব উদ্ভাবনী চিন্তার প্রকাশ আর স্ল্যাং-কাঠি অভিধায় বিশেষ পরিচিতির জন্যে, বছর দুয়েক আগে আচার্য ভালোদা তাকে তৃতীয় 'ক্রিং পুরস্কার' প্রদান করেছিলেন। বেচারা রামকৃষ্ণর ভাগ্য খারাপ, ভবিষ্য ক্রিং পুরস্কারের মনোনয়ন পেয়েও সে তাই বঞ্চিত থেকে গেল। যে রামকৃষ্ণ বিড়ি-সিগারেট পর্যন্ত ছোঁয়নি কোনোদিন, সেই রামকৃষ্ণ একদিন ভরা আড্ডায় প্রসঙ্গক্রমে মদ্য নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা সূত্রে প্রায় পঞ্চাশরকম মদের চরিত্র ও গুণ বিশ্লেষণ করায় আড্ডার মধ্যেই আচার্য

শেষবার আলেখ্যর সামনে

তাকে চতুর্থ ক্রিং পুরস্কারের জন্যে ভবিষ্য ক্রিং হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

ক্রিং পুরস্কার ছাড়াও কাঠিবন আরও কিছু বৈশিষ্ট্য বহন করে চলে। যে-কোনো একটা উপলক্ষ্য খাড়া করে একটু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলা তার মধ্যে একটা। উপলক্ষ্য খোঁজা আর খাওয়া আদায় করায় আমাদের আচার্য ছিলেন সিদ্ধকাম পুরুষ। কারুর হয়তো একটা লেখা ছাপা হয়েছে পত্রিকায় অথবা কোনো সুখবর আছে, আচার্য অম্লান বদনে বলতেন, "খালি হাতে সুখবর! স্বীকৃতি দেওয়া কি উচিত? কম-সে-কম বিজয়কত্তার দোকানের এক বাক্স কাঁচাগোল্লা পেশ করা তো জরুরি।" আবার তেমন কোনো বড়ো সুসংবাদ থাকলে কাঠিবনের সব সদস্যদের নিয়ে 'মাদার্সহাট' অথবা 'হাভেলী'-তে বড়োভোজ দেওয়ার রেওয়াজও আছে। ইতোমধ্যে শিবনাথ চৌধুরী মানে শিবুদা, ডাক্তার রমেন সরকার, দেবাশীষদা, রামকৃষ্ণ, স্বপন (গোপাল) আর শেখরকে এক বা একাধিকবার বড়োভোজ দিতে হয়েছে। ভালোদা আদতে ভোজনরসিক, কিন্তু পেটুক তাঁকে বলা যাবে না কিছুতেই। ভালো মিষ্টির কদর বুঝতেন। বিশেষ করে খ্যাপা ময়রার রসে ডোবানো সরভাজা, বিজয়কত্তার নলেন সন্দেশ, আনন্দময়ীতলার লবঙ্গলতিকা, অধরকত্তার সরপুরিয়া খেতে আচার্য খুবই ভালোবাসতেন। এই খ্যাপা ময়রা সম্পর্কে একটা দারুণ গল্প শুনিয়েছিলেন। পুরসভার হরিজনেরা তাদের রোজকার কাজকর্ম সেরে খ্যাপাদার দোকানের বিখ্যাত পাঁচ-পয়সার কচুরি আর মিষ্টিমাষ্টা খাবার লোভে ভোরবেলাতেই ভিড় জমাত সেখানে। একদিন খ্যাপাদা খদ্দেরকে রসগোল্লা দিতে গিয়ে বুঝলেন যে

একটু টোকো গন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি একটু এসেন্স ছড়িয়ে দিলেন রসগোল্লা। বিজ্ঞ হরিজন খদ্দের তরিযুত করে খেয়ে নিল সেটা, পরে চোখ মটকিয়ে বলল, "খেপাবাবু কাজোল দিয়ে কী হোবে?" যে-সময়ের কথা তখন 'চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কী হবে' গানটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। যাইহোক এসব মিষ্টি, গুটকে কচুরি প্রায়শই আমদানি করা হত কাঠিবনে। সবার একটা করে খাওয়া হয়েছে, রামকৃষ্ণ হয়তো জিজ্ঞেস করল, "আর একটা দেব নাকি স্যার?" গম্ভীর হয়ে নিরীহ মুখ করে ভালোদা উত্তর দিতেন, "মা তো না বলতে শেখায়নি কোনোদিন, মা বলত— ভালো মনে কেউ কিছু দিলে না বলতে নেই।"

আচার্যের সুখকর সঙ্গ লাভের মধ্যে দিয়ে এরকম রসেবসেই কেটেছে আমাদের কাঠিবনের মনোরম আড্ডার পরিসর।

কাঠিবনের সদস্যরা শুধু যে ইনডোর গেমসেই দক্ষ এমন নয়, আউটডোরেও তারা যথেষ্ট পারঙ্গম। ঘরের বাইরে কাঠিবনের প্রথম অভিযান ছিল বর্ধমানের আমরুল গ্রামে। বিভাসের উদ্যোগে আর তত্ত্বাবধানে সেবার যাওয়া হয়েছিল সাধনদাস বৈরাগ্য আর মাকি কাজুমির বাউল আখড়ায়। দামোদরের পাড়-ঘেঁসা আখড়ার স্থায়ীমঞ্চে সেদিন যেন আনন্দের হাট বসেছিল আর তার মধ্যমণি ছিলেন কাঠিবনের আচার্য সুধীর চক্রবর্তী। আখড়ার আবাসিক বাউলেরা তো ছিলেনই, বিভাসের উদ্যোগে সেদিনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিতা, গান, আলোচনা গড়িয়েছিল সেদিন অনেক রাত অবধি। অনুষ্ঠান শেষে দেখা গেল আমার আর সম্পদদার চটিজোড়া খোয়া গিয়েছে। সামনে যে-

চটি পেলাম সেটাই পায়ে গলিয়ে নিয়েছিলাম। ভালোদা সবশুনে মুচকি হেসে বলেছিলেন, "বাইগ্য-বাইগ্য! বাইগ্য খারাপ না-হলি চটি হারায়! তোমাদের অবিশ্যি পদভারি নাহলেও নতুন পাদুকা লাভ তো হল! বাইগ্য সবই বাইগ্য!"

কাঠিবনের দ্বিতীয় অভিযান ছিল ভাল্কিমাচান-এ। জঙ্গলের মধ্যে সুন্দর বাংলো। সেই বাংলোর উঠোনের মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে সন্ধ্যায় জমে উঠেছিল সাঁওতালি নাচের আসর। কাঠিবনের সকলেই খুব উপভোগ করেছিল। আমাদের মধ্যে অনেকেই সেদিন পা-মিলিয়েছিল সেই মায়াবি নাচের ছন্দে। পরদিন সকালে জঙ্গলের গভীরে একটা ফাঁকা জায়গায় পরিত্যক্ত চালাঘরের প্রেক্ষাপটে বসেছিল কাঠিবনের সাহিত্যবাসর। আনসারউদ্দিন আর শংকর সান্যালের গল্পপাঠ, তপনের কবিতাপাঠ আর প্রায় সকল সদস্যের বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল সাহিত্য-আড্ডা। রামকৃষ্ণের সুললিত গানের পরশে সেদিন মেতে উঠেছিল অরণ্যভূমি।

এরপরেও আমরা গিয়েছি বোলপুরের বনলক্ষ্মীর সাজানো-গোছানো রিসর্টে। সেখানেও সাতশো মজা করেছি। সেখানেও বসেছে কাঠিবনের সাহিত্য-আড্ডা। বাইরের সব আসরেই সভাপতিত্ব করেছেন ভালোদা। শুনিয়েছেন তাঁর অমৃতভাষণ, তাঁর ভাবনরাশির সোনারকাঠির ছোঁয়ার উজ্জীবিত হয়েছি আমরা।

এবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল উদ্যোক্তা রামকৃষ্ণ। কিন্তু কোথা থেকে 'করোনা' তার প্রাণঘাতী রক্তচক্ষু নিয়ে সামনে হাজির হল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে, আমাদের সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিল।

শেষবার কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে

এই যে বদ্ধঘরের চৌহদ্দি পেরিয়ে কাঠিবনকে বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা— সেসবের নাটের গুরুও ওই একজনই— তিনি আর কেউ নন, আমাদের আচার্য সুধীর চক্রবর্তী। আর হবে নাই-বা কেন, সারাটা জীবন তো মেলায়-খেলায় পথে-পথেই কেটেছে মানুষের তত্ত্ব-তল্লাসে। সংসার, বয়স এসব তাঁকে আগলে বাঁধতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর মন? সে তো সুদূরের পিয়াসী হয়েই থেকে গিয়েছে শেষতক। সম্পদদা, বিভাস, তপন অথবা শংকর সান্যাল কোনো নতুন অভিযানের পরিকল্পনা করতে বসলেই তিনি গম্ভীরমুখে তাঁর নিজস্ব ভাষায় বলে উঠতেন, "এবার ফৈজত সামলাও!" ভাবখানা যেন— যেতে পারি কিন্তু হাঙ্গামা সামলাতে পারব না।

কাঠিবনের আড্ডায় বিষয় নির্বাচনে কোনো লাগাম ছিল না। লঘু-গুরু যে-কোনো বিষয় নিয়েই জমে উঠত আড্ডা। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে পাশ্চাত্য-সংগীতের প্রভাব কতটা আর কতটাই-বা দেশি। রজনীকান্তর গান শুদ্ধ প্রেমের প্রকাশ নাকি পুরোটাই সমর্পণ? অতুলপ্রসাদের মূল সুরটি কি শুধুই বিরহের? এসব আলোচনার অবসরে আমরা ঋদ্ধ হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্বের কোন গান প্রেমের পরকাষ্ঠা অথবা প্রেমপর্বের কোন গান পূজায় পর্যবসিত হয়েছে, এসব নিয়েও বিস্তর আলোচনা চলত। আবার লালনগীতি অথবা বাউলগানের অন্তর্নিহিত দেহতত্ত্ব নিয়ে সরস আলোচনাও আড্ডার অঙ্গ হয়ে উঠেছে কত সময়। তবে আলোচনা, তা-সে যত গুরুগম্ভীরই হোক, কাঠিবনের চিরবাসন্তিক আবহে শেষ পর্যন্ত হাস্য-পরিহাস আর রসালাপে রাঙিয়ে যেত অবধারিতভাবে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা

নিয়ে এমনই এক ভারী আলোচনা শেষে ভাবনার গভীরে ডুবে আমরা সবাই থম-মেরে আছি। আড্ডা জুড়ে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। এই গুমোট কাটাতে তাঁরই ভাষা ধার করে বললাম, "ভালোদা, তোমার কাছে আমার একটা আপত্তি [অনুরোধ] আছে।" প্রশ্রয়ের গলায় বললেন, "বলে ফেলো।"

বললাম, "আমার স্মরণ-সভায় ছবিতে কাঁপা-কাঁপা হাতে মালা দিয়ে ঘন গলায় তোমায় বলতে হবে— সুবীর খুব ভালো ছেলে ছেলো।"

বললেন, "কে আগে যায় সেটা তো দেখতে হবে।"

আমি বললাম, "তোমরা তো জানো, আমি হলাম গিয়ে সেদ্ধপুরুষ, আমার তাই ইচ্ছামৃত্যু। ভালোদা, তুমি কিন্তু না বলতে পারবা না।"

ভালোদা বলল, "এত য্যাকুন আহিঙ্কে, তেবে তাই হবে। কিন্তু আমার তো সবমাইকে বলা আচে যে আমি মরলে সুবীরকে খবর দিতে, এক জোড়া বাঁশ নিয়ে হাজির হবে সে! আর আমাদের দাহ করার জায়গা তো সেই কবেই ঠিক করা আছে।"

একথা বলার একটা প্রেক্ষিত আছে। ভালোদার অত্যন্ত নিকটাত্মীয়ার প্রয়াণে আমরা দুজন নবদ্বীপ পর্যন্ত শবানুগমন করেছিলাম। তখন তো ইলেক্ট্রিক চুল্লি ছিল না, কাঠের চিতায় দাহ করা হত। দাহকার্য চলছে। আমি আর ভালোদা একটু ফাঁকায় গাছতলায় আশ্রয় নিলাম। সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। উদাসী বাতাস ছুঁয়ে বইছে অনুভবী সময়ের স্রোত। জগৎ-জীবন-মরণ ঘিরে এই যে আমাদের যাপন, তা নিয়ে নানান ভাবের আদান-প্রদান হয়েছিল সেদিন। অবশেষে

ভালোদা বলেছিল, "জীবন যখন আছে তখন মরণ অবশ্যম্ভাবী, জীবনের স্বাভাবিক পরিণতির নামই তো মরণ। এ নিয়ে আবেগে ভাসার দরকার নেই। চলো বরং আমাদের দাহের জায়গা দুটো পছন্দ করে যাই।"

গঙ্গার ধার-ঘেঁসা সবুজ ঘাসে ঢাকা এক টুকরো জায়গা দেখিয়ে ভালোদা সেদিন বলেছিল, "জায়গাটা বেশ ছন্দময়, তাই পছন্দ করলাম।" পাশেই একটা জায়গা আমিও পছন্দ করেছিলাম সেদিন।

প্রাছয় তিরিশ বছর পর নবদ্বীপ শ্মশানে আবার এসেছি। এবার এসেছি ভালোদার শবানুগামী হয়ে। শ্মশানের আবহ বিলকুল বদলিয়ে গিয়েছে। আমাদের পছন্দ করা জায়গা ঢেকে তৈরি হয়েছে পাথর-বাঁধানো বিশাল ঘাট। কাঠের চিতা নেই। ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে চলছে দাহকর্ম। সেই অবসরে কাঠিবনের আমরা ক-জন এসে বসেছি গঙ্গার ধারে। আমরা বসে আছি নিশ্চুপ, মৌন। সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গার অফুরান গৈরিক জলরাশি। এই বয়ে চলার তো শেষ নেই, অনেকটা আমাদের ভাবনাস্রোতের মতোই তা কূলকিনারাহারা। জানি, চুল্লিতে যা পুড়ছে তা শরীর। নশ্বর যা তা তো পঞ্চভূতে বিলীন হবেই। কিন্তু আমাদের ভালোদা! তিনি তো অশেষ। যে-বীজ আমাদের হৃদয়মাঝারে তিনি বপন করে দিয়েছেন তা তো অবিনাশী। তাই আমাদের শোক নেই, আছে শুধু স্মরণ, মনন, অনুগমন। জানি, জীবনের লীলায়-খেলায় আমাদের ভালোদা তাঁর অবিনাশী সত্তা নিয়ে চিরকাল ছিলেন—আছেন—থাকবেন।

আলোকচিত্র: সৈকত মুখার্জি

বার্ষিক সংকলন ১৯৯৭

ধ্রুবপদ

বাংলার বাউল ফকির

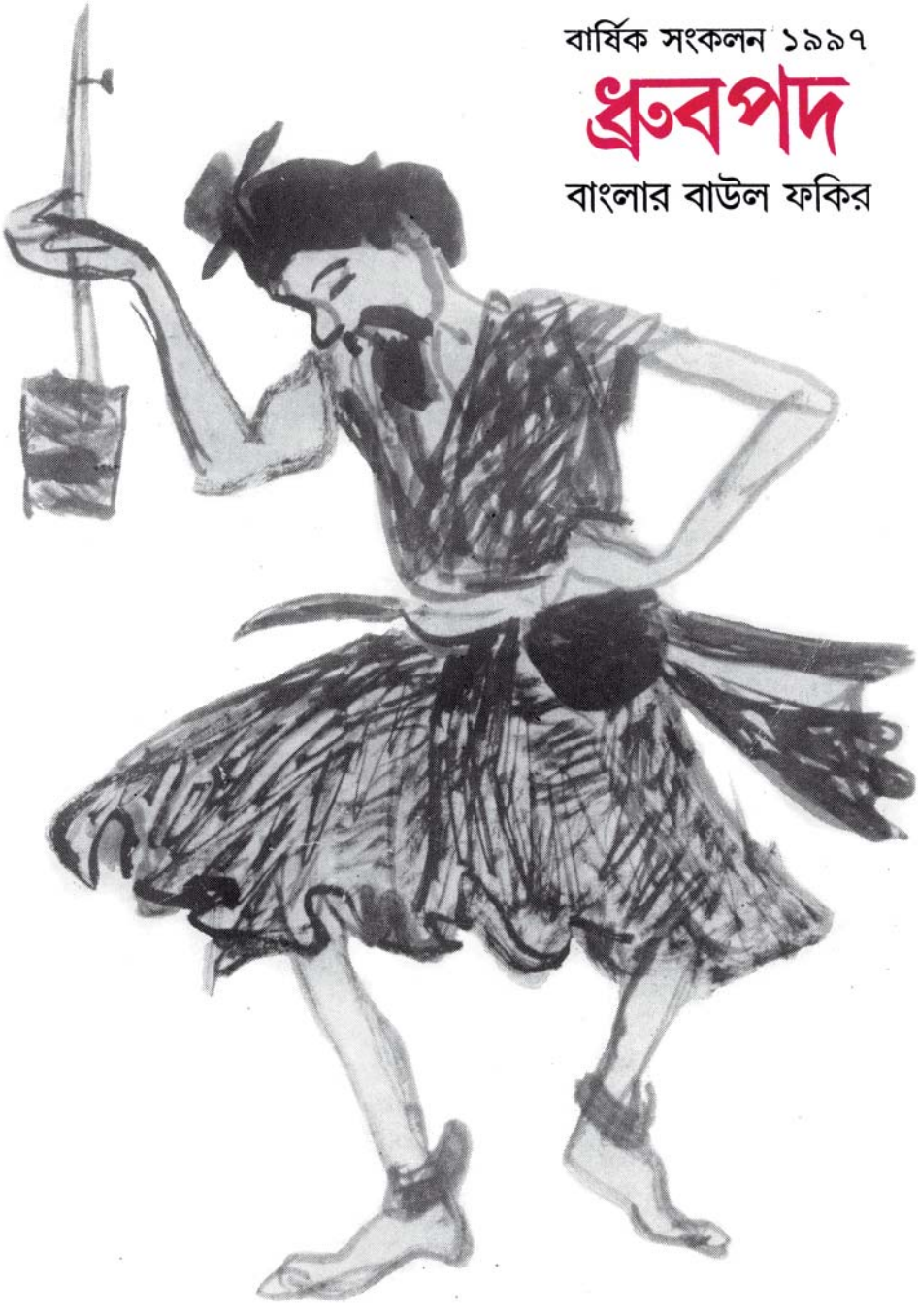

শিল্পী: সোমনাথ হোড়

জীবনীপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি

সংকলক: অভিরূপ মুখোপাধ্যায়

সুধীর চক্রবর্তী: জীবনপঞ্জি

জন্ম : ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। হাওড়া জেলার শিবপুরে।

শিক্ষা: কৃষ্ণনগরের দেবনাথ উচ্চ-বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাঠ গ্রহণ করেছেন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন 'যদুনাথ মহালক্ষ্মী' পুরস্কার। পি.এইচ.ডি করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

কর্মজীবন: অধ্যাপনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে তার উল্লেখ করা হল:

• বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ (১৯৫৮-৬০)।

• কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ (১৯৬০-৭৬), (১৯৮৩-৯৪)। ১৯৯৪ সালে অবসর গ্রহণ।

• চন্দননগর সরকারি কলেজ (১৯৭৬-৮৩)।

• যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যের অতিথি অধ্যাপক (১৯৯৫-৯৬)।

• পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক (২০১১-১৩)।

• হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের অতিথি অধ্যাপক (২০১১-১৩)।

• ইনস্টিটিউট অভ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা-র অতিথি অধ্যাপক (২০১২-১৬)।

পুরস্কার:

তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে প্রস্তুত করা হল:

• 'শিরোমণি' পুরস্কার (১৯৯৩)। *ব্রাত্য লোকায়ত লালন* গ্রন্থের জন্য।

• 'আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন' পুরস্কার (১৯৯৬)।

• দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিং দাস পুরস্কার' (১৯৯৬)। সে-বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা বই হিসেবে *পঞ্চগ্রামের কড়চা* গ্রন্থের জন্য।

• এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত 'বিমানবিহারী মজুমদার' সম্মান (২০০৩)।

• 'আনন্দ' পুরস্কার (২০০২)। *বাউল ফকির কথা* বইয়ের জন্য।

• কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক' (২০০৩)। বিশিষ্ট গবেষক হিসেবে।

• সর্বভারতীয় 'সাহিত্য অকাদেমি' সম্মান (২০০৪)। *বাউল ফকির কথা* বইয়ের জন্য।

• 'এমিনেন্ট টিচার' (২০০৭)। তাঁর বিশিষ্ট অধ্যাপনা-জীবনের স্বীকৃতি স্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এই সম্মাননা জ্ঞাপন করেছেন।

• 'আচার্য সুকুমার সেন স্বর্ণ পদক' (২০১৩)। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত।

• 'রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য' (২০১৪)। কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান।

• 'বিদ্যাসাগর' পুরস্কার (২০১৮)। সারাজীবনের সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত সম্মাননা।

• প্রয়াণ : ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০।

সুধীর চক্রবর্তী: গ্রন্থপঞ্জি

মৌলিক গ্রন্থ :

১. *সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান*, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৮৫, উৎসর্গ: দীর্ঘদিনের সাহিত্যসঙ্গী ও অভিভাবক অজিত দাশ-কে।

২. *গানের লীলার সেই কিনারে*, অরুণা প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৮৫, দ্বিতীয় প্রকাশ: প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৩, উৎসর্গ: নিবেদিতা-কে/'মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে'।

৩. *কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ*, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতার পক্ষে কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫, উৎসর্গ: প্রয়াত জেহাদন নবি মোল্লা-র স্মৃতিতে।

৪. *বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান*, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৮৬, উৎসর্গ: শ্রীমান মনোরঞ্জন রায়, শ্রীমান রণজিৎ প্রামানিক/স্নেহভাজনেষু।

৫. *গভীর নির্জন পথে*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই, ১৯৮৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ: জুলাই ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ: এপ্রিল ২০০৮, পঞ্চম মুদ্রণ: জুন ২০১১, উৎসর্গ: বাবা ও মার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে।

৬. *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণ বিস্মরণ*, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৮৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ: এম. সি. সরকার এন্ড সনস্, মার্চ ২০০৮, উৎসর্গ: অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত/শ্রদ্ধাস্পদেষু।

৭. *বাংলা গানের সন্ধানে*, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯০, দ্বিতীয় প্রকাশ: প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৩, উৎসর্গ: অধ্যাপক ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়/শ্রদ্ধাস্পদেষু।

৮. *সদর-মফস্বল*, প্রজ্ঞা প্রকাশন, নভেম্বর ১৯৯০, দ্বিতীয় প্রকাশ: প্যাপিরাস, জানুয়ারি ২০০১, উৎসর্গ: শ্রীধীরেন দেবনাথ/স্নেহভাজনেষু।

৯. *অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ*, আজকের সাহিত্য, ২৮ মার্চ ১৯৯২, দ্বিতীয় প্রকাশ ও মুদ্রণ: পরম্পরা, জানুয়ারি ২০১২, উৎসর্গ: শ্রীমান রমাপ্রসাদ দত্তকে/স্নেহোপহার।

১০. *নির্জন এককের গান রবীন্দ্র সংগীত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট

লিমিটেড, ১৯৯২, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০১১, উৎসর্গ: শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ/শ্রদ্ধাভাজনেষু।

১১. *বাংলা গানের চার দিগন্ত*, অনুষ্টুপ, ১৯৯২, দ্বিতীয় মুদ্রণ: আগস্ট ১৯৯৮, তৃতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৭, প্রতিভাস সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা, উৎসর্গ: প্রথম যৌবনের বন্ধু তারাপ্রসন্ন ঘটক এবং পরিণত বয়সের বন্ধু তরুণ কান্তি সেন-কে/ভালোবেসে।

১২. *ব্রাত্য লোকায়ত লালন*, পুস্তক বিপণি, ১৯৯২, দ্বিতীয় মুদ্রণ: আগস্ট ১৯৯৮, তৃতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৭, উৎসর্গ: 'যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে/তখন ভাবের খেলা ভেঙে যাবে'।

১৩. *চালচিত্রের চিত্রলেখা*, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৩। উৎসর্গ: 'বারোমাস' সম্পাদক অশোক সেন, 'এক্ষণ' সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য-কে।

১৪. *বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ রায়*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৪, নতুন সংস্করণ: গাঙচিল, জানুয়ারি ২০০৮, উৎসর্গ: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়/বন্ধুবরেষু।

১৫. *লালন এবং তাঁর সমকালীন লোকধর্ম*, সূচনা কালচারাল সেন্টার, ১৯৯৪।

১৬. *নির্বাস*, থীমা, ১৯৯৫, নতুন সংস্করণ: গাঙচিল, মে ২০১৭, উৎসর্গ: শঙ্খ ঘোষ/অগ্রজপ্রতিমেষু।

১৭. *পঞ্চগ্রামের কড়চা*, প্রতিক্ষণ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫, নতুন সংস্করণ: ঋতাক্ষর, জানুয়ারি ২০১৭।

১৮. *পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব*, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, উৎসর্গ: আবুল বাশার ও সাহানাকে/দাদা।

১৯. *দেবব্রত বিশ্বাসের গান*, রক্তকরবী, ১৯৯৭।

২০. *লালন*, প্যাপিরাস, আগস্ট ১৯৯৮, উৎসর্গ: শ্যামল-ঝর্ণা-চয়নকে/সস্নেহে।

২১. *মাটি-পৃথিবীর টানে*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় প্রকাশ ও মুদ্রণ: পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০০৯, উৎসর্গ: শ্রেয়া আর সন্দীপকে।

২২. *বাউল ফকির কথা*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ ও নব প্রকাশ: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ: জুলাই ২০১২, উৎসর্গ: শ্রীঅমিয়কুমার বাগচী/শ্রীমতী যশোধরা বাগচী/সৌমিত্রেষু।

২৩. *বাংলা গানের আলোকপর্ব*, ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন, কলকাতা, ২০০১, উৎসর্গ: যতীন্দ্রনাথ ও পারমিতা মুখোপাধ্যায়কে/প্রীতি-উপহার।

২৪. *গানে গানে গাওয়া*, অবভাস, জানুয়ারি, ২০০৩, উৎসর্গ: গানের রসিক সুভাষ চৌধুরী ও সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়কে/ বন্ধুতার টানে।

২৫. *বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি*, পুস্তক বিপণি, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও সম্মিলিত সংস্করণ: মে ২০১৩, উৎসর্গ: স্নেহভাজন দীপঙ্কর কুমার, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়-কে/প্রত্যুপহার।

২৬. *রূপে বর্ণে ছন্দে*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৩, দ্বিতীয় প্রকাশ: কারিগর, সেপ্টেম্বর ২০১১, উৎসর্গ: প্রয়াত অনুপকুমার মাহিন্দার-কে।

২৭. *লেখা পড়া করে যে*, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩, উৎসর্গ: আমার সহধ্যায়ী অমিতাভ দাশগুপ্ত, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, তারাপদ রায়, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, সুনন্দ সান্যাল, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার দাশ, শীতল চৌধুরীকে/স্বপ্ন দিয়ে তৈরি স্মৃতি দিয়ে ঘেরা সময়ের স্মরণে।

২৮. *গৌণধর্মে বাঙালি ও লালনপন্থা*, কলকাতা, যোগী-অধিকারী সমাজ বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্র, ২০০৩। (অধ্যাপক নীহার কুমার সরকার স্মারক বক্তৃতা)

২৯. *উৎসবে মেলায় ইতিহাসে*, পুস্তক বিপণি, অক্টোবর ২০০৪, উৎসর্গ: ভ্রামণিক বিমান সোম ও বন্দনা সোম-কে।

৩০. *ঘরানা বাহিরানা*, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০০৬, উৎসর্গ: শ্রীদেবাশিস মুখোপাধ্যায়/শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়-কে/সস্নেহে।

৩১. *কবিতার বিচিত্রপথে*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জুলাই ২০০৬, নতুন সংস্করণ: প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৫, উৎসর্গ: কবিতাজীবী শ্রীমান প্রাণেশ সরকার/স্নেহভাজনেষু।

৩২. *গান হতে গানে*, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০০৮। উৎসর্গ: শ্রী কুন্তল মিত্র/স্নেহভাজনেষু।

৩৩. *লোকায়তের অন্তরমহল*, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০০৮।

৩৪. *শামুক ঝিনুক*, দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৯, উৎসর্গ: জামসেদপুরবাসী শ্রীদিলীপ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রত্না ভট্টাচার্য/স্নেহভাজনেষু।

৩৫. *আখ্যানের খোঁজে*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০০৯, উৎসর্গ: শ্রীপ্রদ্যুতকুমার গোস্বামী, শ্রীমতি গায়েত্রী গোস্বামী/করকমলে।

৩৬. *লোকসমাজ ও লোকচিত্র*, শান্তিপুর, কলাকুশলী, আগস্ট ২০০৯, নতুন সংস্করণ: পত্রলেখা, ২০১২। (ললিতমোহন সেন স্মারক বক্তৃতা, ২০০৯)

৩৭. *রবীন্দ্রনাথ অনেকান্ত*, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১০, দ্বিতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১১, তৃতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০১২, নতুন সংস্করণ: ঋতবাক জানুয়ারি ২০১২, উৎসর্গ: আমার প্রাক্তনতম দুই ছাত্র শ্রীমান প্রণব দাশগুপ্ত ও শ্রীমান বরেণ সরকার-কে।

৩৮. *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০১০, উৎসর্গ: সূত্রাগড়ের পার্থ চক্রবর্তী, চন্দননগরের সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কোলাঘাটের মধুসূদন মুখোপাধ্যায়/ স্নেহভাজনেষু।

৩৯. *নির্জনসজনে*, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১১, উৎসর্গ: আমার সকল কাজের কাজি/ শ্রীমান শমিত আচার্যকে।

৪০. *আলালদোস্ত সেবাকমলিনী লালন*, কারিগর, জানুয়ারি ২০১১, উৎসর্গ: আনসারউদ্দিন, মোশারফ হোসেন/ স্নেহভাজনেষু।

৪১. মানিনী রূপমতী কুবির গোঁসাই, কারিগর, জানুয়ারি ২০১২, উৎসর্গ: শ্রীমান প্রবুদ্ধ বাগচী/স্নেহভাজনেষু।

৪২. *কবিতার খোঁজে*, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১২। উৎসর্গ: কবিসম্মেলন পত্রিকার সম্পাদক/কবি শ্যামলকান্তি দাশ/এবং/ঐ পত্রিকার কবিতাপ্রেমী প্রকাশক/গুণেন শীল-কে।

৪৩. *দেখা না দেখায় মেশা*, লালমাটি, জানুয়ারি ২০১২, উৎসর্গ: সুরঞ্জন আর প্রণতিকে।

৪৪. *সুধীর চক্রবর্তী রচনাবলি*, প্রথম খণ্ড, লালমাটি, জানুয়ারি ২০১২, উৎসর্গ: শ্রীশ্যামল ভৌমিক স্নেহাস্পদেষু।

৪৫. *নির্বাচিত আখ্যান*, পরম্পরা, মে ২০১২, উৎসর্গ: শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু।

৪৬. *কত রঙের নক্‌শি কাঁথা*, পরম্পরা, জানুয়ারি ২০১৩, উৎসর্গ: ভাবুক ও লেখক/শ্রীসন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়/ প্রিয়বরেষু।

৪৭. *সুধীর চক্রবর্তী রচনাবলি*, দ্বিতীয় খণ্ড, লালমাটি, জানুয়ারি ২০১৩, উৎসর্গ: শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়/বন্ধুবরেষু।

৪৮. *ছড়ানো এই জীবন, লালমাটি*, জানুয়ারি ২০১৩, উৎসর্গ: নীলকমল আর মল্লিকা-কে।

৪৯. *ভদ্রজনের দৃষ্টিতে লালন ফকির*, সম্পাদনা : অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, কাউন্সিল ফর পলিটিক্যাল স্ট্যাডিজ, ৩০ এপ্রিল ২০১৩। (সপ্তদশ চন্দনকুমার ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা।)

৫০. *সাহিত্যের লোকায়ত পাঠ*, পত্রলেখা, আগস্ট ২০১৩, উৎসর্গ: বইপাগল/শ্রীঅরুণ দে-কে।

৫১. *অনেক দিনের অনেক কথা*, কারিগর, আগস্ট ২০১৩, ধ্রুবপদ, ডিসেম্বর ২০১৭, উৎসর্গ: শ্রীমান অভ্র ঘোষ-কে।

৫২. *অবতলের রূপাবলি*, অবতলের পদাবলি, ধ্রুবপদ, জুন ২০১৩। (লেখকের রচিত কবিতা, তরুণকান্তি সেন কর্তৃক অনূদিত, কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত-র ছবি ও সুব্রত চৌধুরীর স্কেচের যৌথ সংকলন)

৫৩. *বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে*, লালমাটি, বইমেলা ২০১৪, উৎসর্গ: আমাদের পরিবারের সুহৃদ দীপঙ্কর আর রত্না-কে।

৫৪. *লোকায়তের অন্য বাঁকে*, সংবাদ, জানুয়ারি ২০১৪, উৎসর্গ: পারিবারিক বন্ধু ডা. বাসুদেব মণ্ডল-কে।

৫৫. *সুধীর চক্রবর্তী রচনাবলি*, তৃতীয় খণ্ড, লালমাটি, জানুয়ারি ২০১৪, উৎসর্গ: শ্রীরঙ্গন চক্রবর্তী/প্রীতিভাজনেষু।

৫৬. *প্রেমে প্রাণে গানে*, প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৪, উৎসর্গ: স্নেহভাজন শ্রীমান জয় গোস্বামীকে প্রত্যুপহার।

৫৭. *রবিকররেখা*, সিগনেট প্রেস, জুন ২০১৪, উৎসর্গ: দিল্লিবাসী রবীন্দ্রব্রতী শ্রীসুধীর চন্দ/শ্রদ্ধাভাজনেষু।

৫৮. *আকুল প্রাণের উৎসবে*, মন্দাক্রান্তা, জুলাই ২০১৪, উৎসর্গ: পারিবারিক বন্ধু শ্রীদেবাশিস মণ্ডল/স্নেহভাজনেষু।

৫৯. *নিভৃত মনের ছায়া*, অলকানন্দা পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৫, উৎসর্গ: কৃষ্ণজিৎ আর ঈশিতা-কে।

৬০. *দ্বিরালাপ*, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১৫, উৎসর্গ: নাটকের মানুষ/কৌশিক আর রাত্রি চট্টোপাধ্যায়-কে।

৬১. *গানের ভিতর দিয়ে*, মডার্ন কলাম, জানুয়ারি ২০১৫, উৎসর্গ: কল্যাণীয় বিদ্যুৎ হালদার/স্নেহভাজনেষু।

৬২. *আমার রবীন্দ্রনাথ*, পরম্পরা, জানুয়ারি ২০১৫, উৎসর্গ: বইপাগল আমার তিন তরুণ-বন্ধু/দেবাশিস গোস্বামী, মলয় সরকার, জানকী মুখোপাধ্যায়-কে।

৬৩. *সুধীর চক্রবর্তী রচনাবলি*, চতুর্থ খণ্ড, লালমাটি, বইমেলা ২০১৫, উৎসর্গ: বাংলা গানের জহুরি শ্রীঅরুণকুমার বসু/সুহৃদবরেষু।

৬৪. *লালন সাঁই কুবির গোঁসাই আর তাঁদের গান*, ইন্ডিক হাউস, জানুয়ারি ২০১৫, উৎসর্গ: ডিউক মৈত্র/শ্রুতি মৈত্র-কে।

৬৫. *শিল্পের খোঁজে*, উদ্ভাস, রচনাকাল: ২০১৪, প্রকাশ: আগস্ট ২০১৬, উৎসর্গ: গড়ে ওঠার পর্বে আমার নাতি আর নাতনি দীপ্ত ও দিঠির জন্যে।

৬৬. *বিচিত্র লোকায়ত*, পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০১৬, উৎসর্গ: নবীন পদাতিকদের।

৬৭. *শত গানের গানমেলা*, প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৭, উৎসর্গ: শ্রীমান শৌণক লাহিড়ী-কে।

৬৮. *সুধীর চক্রবর্তী রচনাবলি*, পঞ্চম খণ্ড, লালমাটি, বইমেলা ২০১৭, উৎসর্গ: ল্যাডলি মুখোপাধ্যায়-কে।

৬৯. *কৃষ্ণনাগরিকের কত কথা*, মিত্র ও ঘোষ, বৈশাখ ১৪২৪, পরিবারের আত্মজন সুশান্ত বসু ও সুলেখা বসু-কে/তাদের দাম্পত্যের সুবর্ণ-জয়ন্তী স্মারক।

৭০. *শত শত গীতমুখরিত*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস্, মে ২০১৮, উৎসর্গ: শ্রীমান অভিরূপ মুখোপাধ্যায়/কল্যাণীয়েষু।

৭১. *ভুবনজোড়া আসনখানি*, লালমাটি, বইমেলা ২০১৮, উৎসর্গ: শ্রীঅলোককুমার ভৌমিক/শ্রীমতি সুজাতা ভৌমিক/সস্নেহে।

৭২. *রজনীকান্ত: দ্বিধাহীন অনুভূতির চারণ*, সম্পাদনা ও সংযোজন: শিবশঙ্কর পাল, ধ্রুবপদ, অক্টোবর ২০১৮, উৎসর্গ: চন্দন আর পিয়ালীকে।

৭৩. *আলালদোস্ত আর তিন সহজিয়া আখ্যান*, পরম্পরা, জানুয়ারি ২০১৯। উৎসর্গ: আমার আখ্যান অনুরাগী/অধ্যাপক মলয় রক্ষিত/স্নেহভাজনেষু।

৭৪. *সংস্কৃতির লোকায়ন*, পুস্তক বিপণি, বইমেলা ২০১৯, উৎসর্গ: অনুজ লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী/স্নেহভাজনেষু।

৭৫. *একশো গানের মর্মকথা*, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০১৯, উৎসর্গ: গানপাগল আমার প্রাক্তন ছাত্র বরিষ্ঠ গীতিকার সৈকত কুণ্ডু/স্নেহভাজনেষু।

৭৬. *সুধীর চক্রবর্তী রচনাবলি*, ষষ্ঠ খণ্ড, লালমাটি, বইমেলা ২০১৯, উৎসর্গ: দিল্লিবাসী সংস্কৃতিমনা হিমাদ্রি দত্ত-কে।

৭৭. *নূতন দেখার দেখা*, পারুল, ২০১৯, উৎসর্গ: আমাদের পারিবারিক বন্ধু/শ্রীশিবশঙ্কর পাল, শ্রীমতি নন্দিতা পালকে/স্নেহোপহার।

৭৮. *এলেম নতুন দেশে*, সিগনেট প্রেস, ডিসেম্বর ২০১৯, উৎসর্গ: স্নেহভাজন ছাত্র শ্রী সম্পদনারায়ণ ধর-কে/রবীন্দ্রচর্চা যার জীবনচর্যা।

৭৯. *মেঘে মেঘে তারায় তারায়*, মুদ্রা, বড়োদিন ২০১৯, উৎসর্গ: আমাদের পরিবারের আত্মজন অজয় ও পম্পা চক্রবর্তী-কে/স্নেহোপহার।

সম্পাদিত গ্রন্থ :

১. *অমৃত যন্ত্রণা: প্রেমের কবিতার সংকলন*, প্রথম প্রকাশ : পূর্বমেঘ প্রকাশ ভবন, ডিসেম্বর ১৯৫৬, নতুন সংস্করণ: ফটিক জল প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০৩।

২. *রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প*, প্রথম প্রকাশ: অচলায়তন প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৬১, দ্বিতীয় প্রকাশ: ধ্রুবপদ, পরিবেশক: কারিগর, ২০১১, উৎসর্গ: ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতবর্ষে প্রকাশিত এই বইয়ের লেখকদের মধ্যে যাঁরা প্রয়াত সেই ক্ষুদিরাম দাশ, দেবীপদ ভট্টাচার্য, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়,

রাজ্যেশ্বর মিত্র, হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও নিখিলকুমার নন্দী/এবং/প্রকাশক দুলালচন্দ্র সাধুখাঁ-র স্মৃতিতে।

৩. *আধুনিক বাংলা গান*, পরিবেশক: প্যাপিরাস, এপ্রিল ১৯৮৮, নতুন সংস্করণ: প্রতিভাস, আগস্ট ২০১৫, উৎসর্গ: স্নেহভাজন/তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কে।

৪. *বাংলা দেহ তত্ত্বের গান*, প্রজ্ঞা প্রকাশন, ১৯৯০ জানুয়ারি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ : পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০০০, উৎসর্গ: সৌম্য দাশগুপ্তকে/সস্নেহে।

৫. *দিলীপকুমার রায় : স্মৃতি বিস্মৃতির শতবর্ষ*, পরিবেশক: পুস্তক বিপণি, জুলাই ১৯৯৭।

৬ *বাংলার বাউল-ফকির*, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০০৯।

৭. *জনপদাবলি*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০ মে ২০০১, নতুন সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৮, উৎসর্গ: শ্রীঅশোক রায়/শ্রীমতি নূপুরিকা রায়, স্নেহাস্পদেষু।

৮. *যৌনতা ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ২০০২, উৎসর্গ: শ্রীতপন মুখোপাধ্যায়/ভারতী মুখোপাধ্যায়-কে/সস্নেহে।

৯. *বরণমালিকা: দিলীপকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, কলকাতা, সুরকাব্য ট্রাস্ট, ২০০৩।

১০. *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, পুস্তক বিপণি, জুন ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১১, উৎসর্গ: দীনেন্দ্র চৌধুরী/ অবিস্মরণীয়েষু।

১১. *নির্বাচিত ধ্রুবপদ*, প্রথম খণ্ড, গাঙচিল, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, উৎসর্গ: এক দশকের যাত্রাপথের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী/শিবনাথ ভদ্র/স্নেহাস্পদেষু।

১২. *দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৮।

১৩. *নির্বাচিত ধ্রুবপদ*, দ্বিতীয় খণ্ড, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০০৯, উৎসর্গ: ধ্রুবপদের অন্দরমহলের মানুষ, শিল্পী সোমনাথ ঘোষ/প্রীতিভাজনেষু।

১৪. *গবেষণার অন্দর বাহির*, পুস্তক বিপণি, ২০১০, উৎসর্গ: পরহিতব্রতী শ্রীমান সুশীল সাহা/প্রীতিভাজনেষু।

১৫. *মেয়েদের কথাকল্প*, অক্ষর প্রকাশনী, মার্চ ২০১০, উৎসর্গ: শ্রীমতি শ্যামলী চক্রবর্তী/কল্যাণীয়েষু।

১৬. *নির্বাচিত ধ্রুবপদ*, তৃতীয় খণ্ড, গাঙচিল, মে ২০১০, উৎসর্গ: ধ্রুবপদের আপনজন অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু।

১৭. *নানা রবীন্দ্রনাথের মালা*, পত্রলেখা, মে ২০১০, উৎসর্গ: অগ্রজকল্প/শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী/শ্রদ্ধাস্পদেষু।

১৮. *নির্বাচিত ধ্রুবপদ*, চতুর্থ খণ্ড, গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১১। উৎসর্গ: ধ্রুবপদের অন্দরমহলের ঝক্কিঝামেলা যাঁকে সামলাতে হয়েছে সেই নিবেদিতা চক্রবর্তীকে।

১৯ *বাংলা গান অদীন ভুবন*, কারিগর, আগস্ট ২০১১, উৎসর্গ: কবিতা আর গানের ভেলায় টালমাটাল/শ্রীরামকৃষ্ণ দে/স্নেহভাজনেষু।

২০. *রবীন্দ্রনাথ: বাকপতি বিশ্বমনা*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবপ্রকর্ষ চর্চা কেন্দ্র, কলকাতা, (পরিবেশক : কারিগর) প্রথম খণ্ড, মে ২০১১।

২১. *রবীন্দ্রনাথ: বাকপতি বিশ্বমনা*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবপ্রকর্ষ চর্চা কেন্দ্র, কলকাতা, (পরিবেশক: কারিগর) দ্বিতীয় খণ্ড, আগস্ট ২০১১।

২২. *নির্বাচিত ধ্রুবপদ*, পঞ্চম খণ্ড, গাঙচিল, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, উৎসর্গ: নির্বাচিত ধ্রুবপদ সংকলনে একনিষ্ঠ কর্মী/অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য-কে।

২৩. *নির্বাচিত ধ্রুবপদ*, ষষ্ঠ খণ্ড, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৪, উৎসর্গ: দরদী প্রকাশক/শ্রীমতি অণিমা বিশ্বাস-কে।

২৪. *দিলীপকুমার রায়: এক উপেক্ষিত বাঙালি*, আদম, ২৫ বৈশাখ ১৪২৩, উৎসর্গ: মুম্বাইবাসী স্নেহভাজন/পড়ুয়া দম্পতি/সুদীপ ও সুলগ্না পুরকায়স্থ-কে।

যুগ্ম-সম্পাদনা :

১. *রবীন্দ্রনাথ/বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়*, সম্পাদনা : সত্যজিৎ চৌধুরী-সুধীর চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, মে, ১৯৯৯।

২. *সবহারাদের গান/বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়*, সম্পাদনা : সুধীর চক্রবর্তী-

রামকৃষ্ণ দে, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার, ১৫ আগস্ট ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০ জুন ১৯৯৫।

সম্পাদিত পত্রিকা :

সুধীর চক্রবর্তী-র সম্পাদনায় ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল বার্ষিক পত্রিকা 'ধ্রুবপদ'-এর বারোটি বিশেষ সংখ্যা। এখানে সংখ্যাগুলির বিষয়-নাম উল্লেখ করা হল:

১. দিলীপকুমার রায় ও অমিয়নাথ সান্যাল জন্মশতবর্ষ, ১৯৯৬।
২. বাংলার বাউল-ফকির, ১৯৯৭।
৩. বাংলা গান, ১৯৯৯।
৪. বুদ্ধিজীবীর নোটবই, ২০০০।
৫. যৌনতা ও সংস্কৃতি, ২০০১।
৬. দৃশ্যরূপ, ২০০২।
৭. অভিজ্ঞতা, ২০০৩।
৮. রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪।
৯. নারীবিশ্ব, ২০০৫।
১০. পথের পাঁচালী, ২০০৬।
১১. অন্যরকম বাঙালি, ২০০৭।
১২. গবেষণার অন্তরমহল, ২০০৮।

প্রকাশনা :

১. সুমন চট্টোপাধ্যায়, *সুমনের গান, সুমনের ভাষ্য*, ভূমিকা : সুধীর চক্রবর্তী, ধ্রুবপদ, ১৯৯৪।
২. আনসারউদ্দিন, *আনসারউদ্দিনের গল্প*, ধ্রুবপদ, জানুয়ারি ১৯৯৪।

অনূদিত গ্রন্থ :

১. *Baul-Fakir-Dervish of Bengal/Along Deep Lonely Alleys*, Utpal K. Banerjee, Niyogi Books, মূল-গ্রন্থ : গভীর নির্জন পথে।
২. *On Folk-Cult and Rabindrasangeet*, Pranesh Sarkar, 'সে আগুন ছড়িয়ে গেল', 'লোকায়তের অন্তরমহল'— প্রবন্ধ দুটির অনুবাদের সংকলন।

বিভিন্ন সময়ে শিল্পী সোমনাথ ঘোষের করা
সুধীর চক্রবর্তী লিখিত, সম্পাদিত গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রচ্ছদ

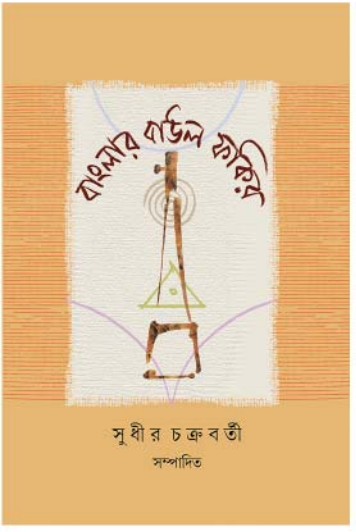

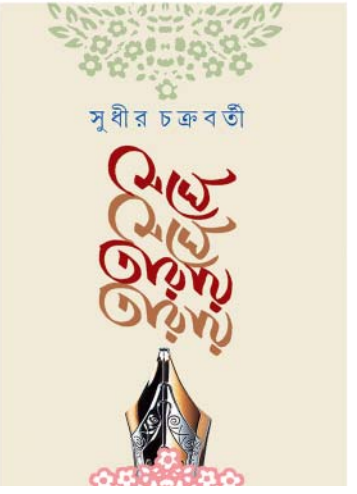

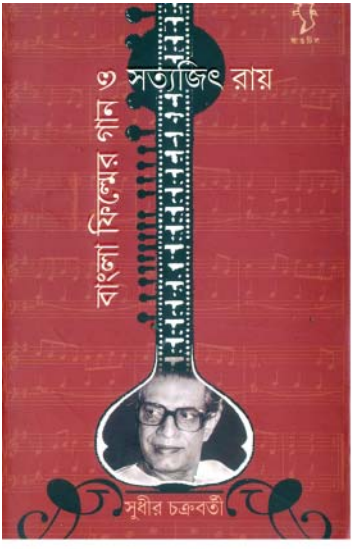
বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ রায়
সুধীর চক্রবর্তী

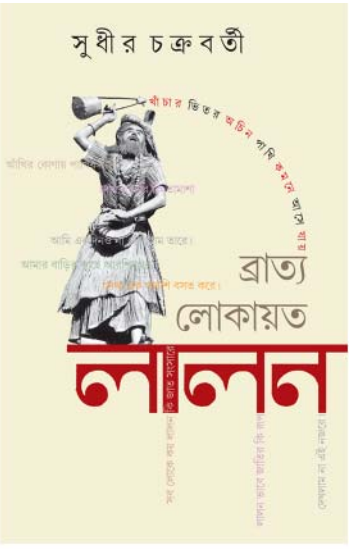
সুধীর চক্রবর্তী
ব্রাত্য লোকায়ত
লালন

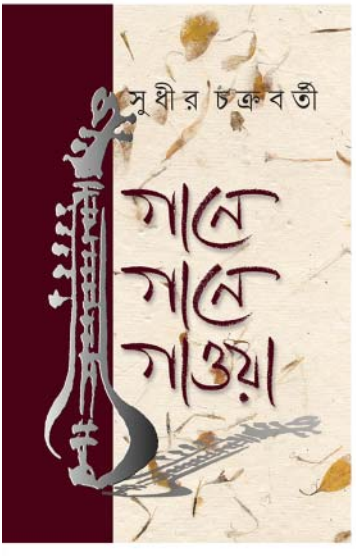
সুধীর চক্রবর্তী
গানে গানে গাওয়া

মেয়েদের
ছড়াগান
সম্পাদক
সুধীর চক্রবর্তী

শিল্পী: সোমনাথ ঘোষ

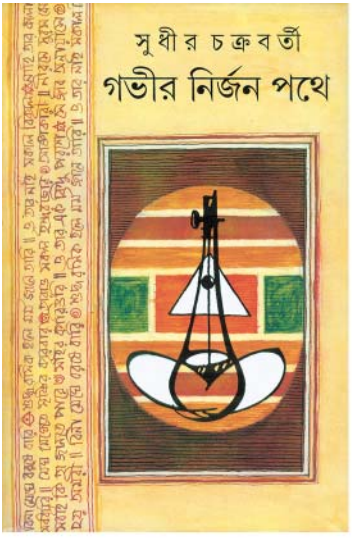
সুধীর চক্রবর্তী
গভীর নির্জন পথে

সুধীর চক্রবর্তী
বাউল ফকির কথা

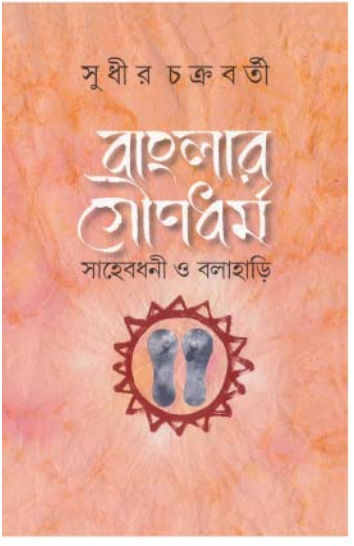
সুধীর চক্রবর্তী
বাংলার সোনধর্ম
সাহেবধনী ও বলাহাড়ি

বাংলার
বাউল ফকির
সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত

শিল্পী: সোমনাথ ঘোষ

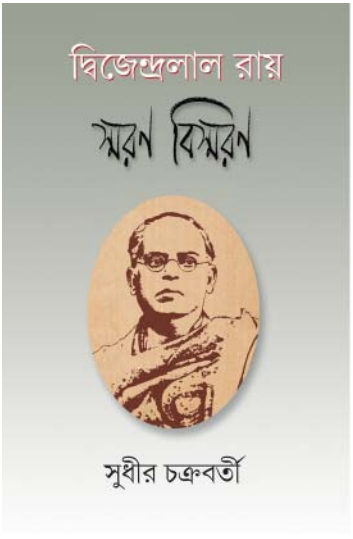

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
স্মরণ বিস্মরণ
সুধীর চক্রবর্তী

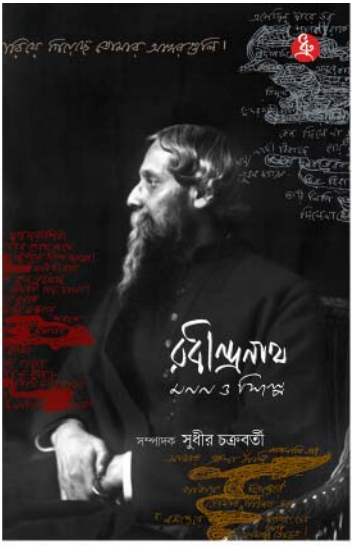

রবীন্দ্রনাথ
মনন ও শিল্প
সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী

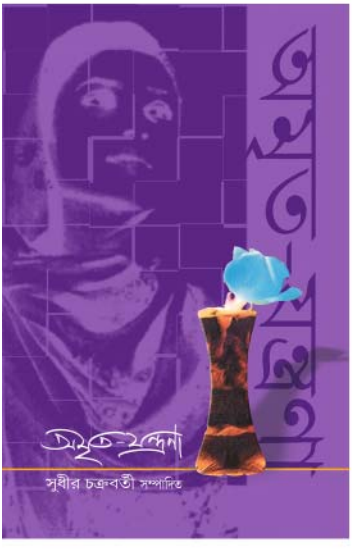

সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত

সুধীর চক্রবর্তী
রূপে বর্ণে ছন্দে
কারিগর

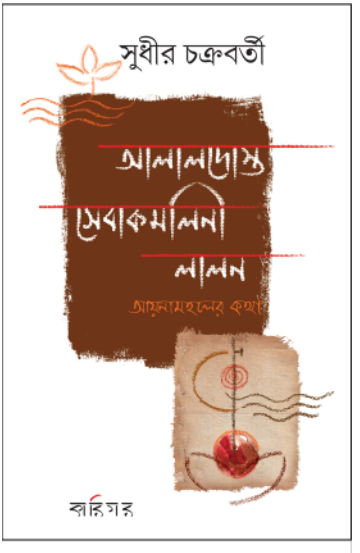

সুধীর চক্রবর্তী
আলালদোস্ত
সেবাকমলিনা
লালন
আয়নামহলের কথা
কারিগর

নি র্বা চি ত
সম্পাদক
সুধীর চক্রবর্তী

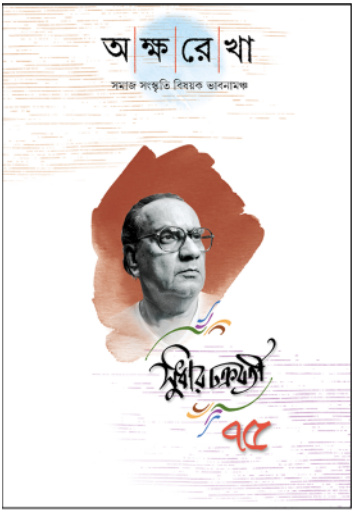

অ ক্ষ রে খা
সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক ভাবনামঞ্চ
সুধীর চক্রবর্তী
৭৫

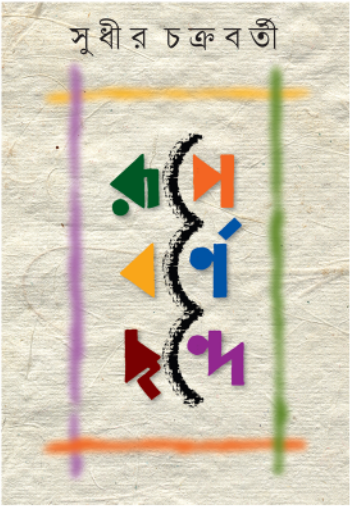

সু ধী র চ ক্র ব র্তী

১
রবীন্দ্রনাথ বাক্‌পতি বিশ্বমনা
রবীন্দ্রনাথ
বাক্‌পতি বিশ্বমনা
সম্পাদক
সুধীর চক্রবর্তী

২
রবীন্দ্রনাথ বাক্‌পতি বিশ্বমনা
রবীন্দ্রনাথ
বাক্‌পতি বিশ্বমনা
সম্পাদক
সুধীর চক্রবর্তী

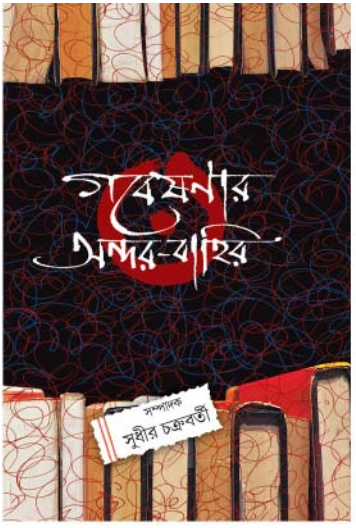
গবেষণার
অন্দর-বাহির
সম্পাদক
সুধীর চক্রবর্তী

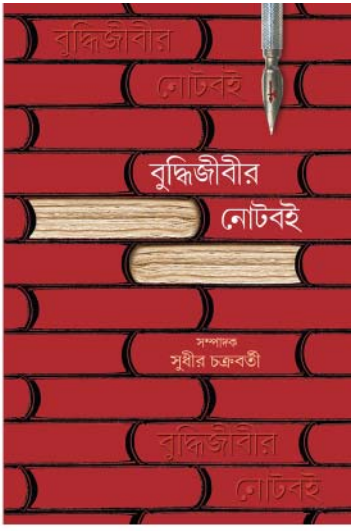
বুদ্ধিজীবীর
নোটবই
বুদ্ধিজীবীর
নোটবই
সম্পাদক
সুধীর চক্রবর্তী
বুদ্ধিজীবীর
নোটবই

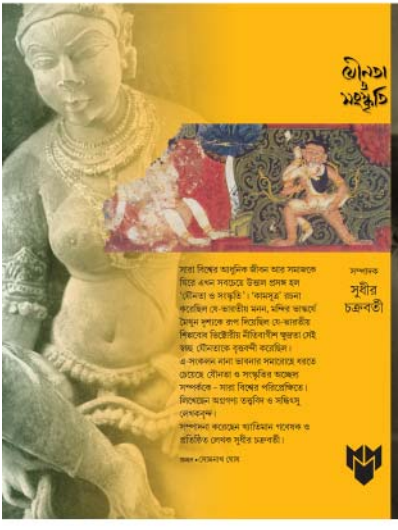
যৌনতা ও সংস্কৃতি
সম্পাদক
সুধীর
চক্রবর্তী

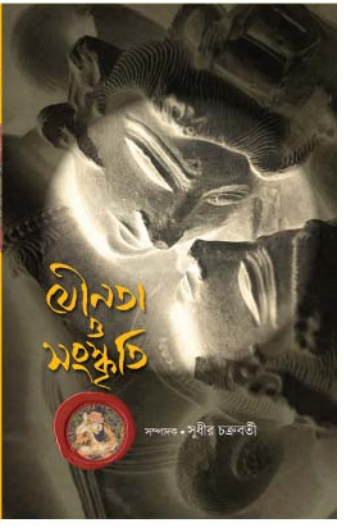
যৌনতা
ও সংস্কৃতি
সম্পাদক • সুধীর চক্রবর্তী

ধ্রুবপদ
প্রসঙ্গ বাংলাগান

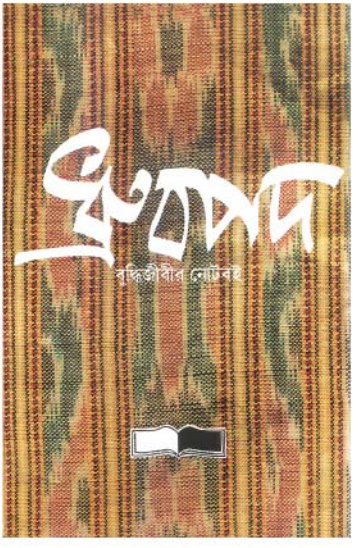

ধ্রুবপদ
বুদ্ধিজীবীর নোটবই

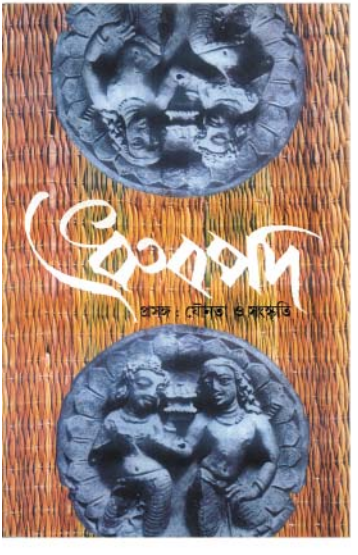

ধ্রুবপদ
প্রসঙ্গ : যৌনতা ও সংস্কৃতি

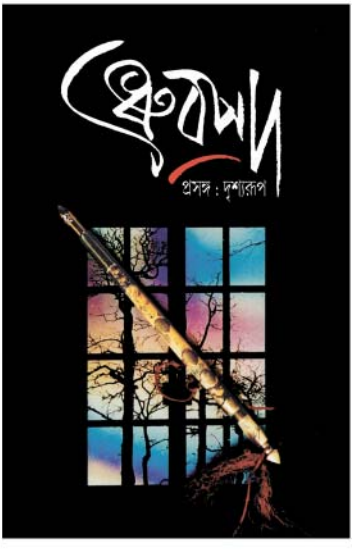

ধ্রুবপদ
প্রসঙ্গ : দৃশ্যরূপ

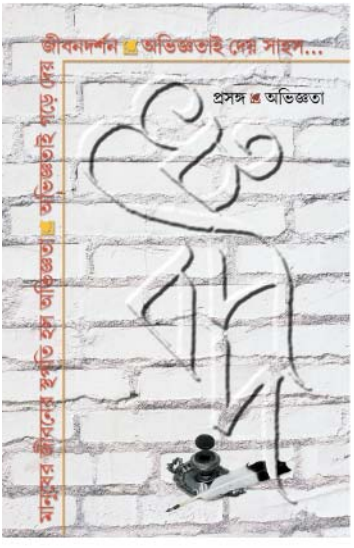

জীবনদর্শন অভিজ্ঞতাই দেয় সাহস...
প্রসঙ্গ অভিজ্ঞতা

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ

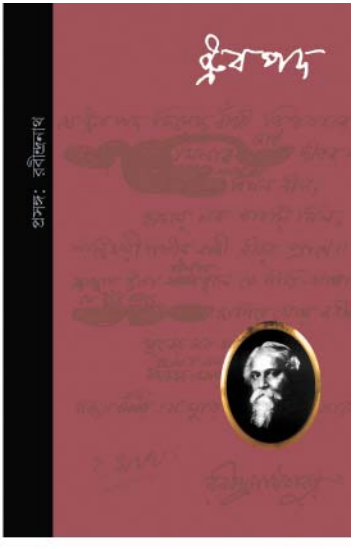

২০০৫
মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র 'বঙ্গমহিলা' প্রকাশিত
হয় ১৮৭০ সালে
নারীবিশ্ব

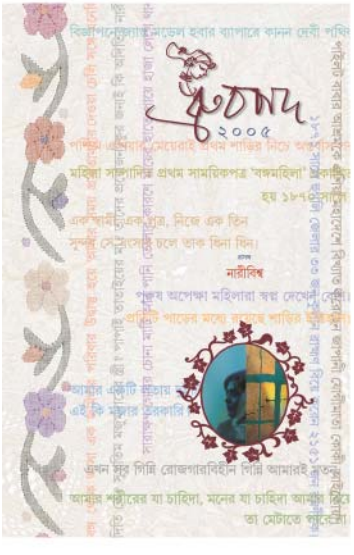

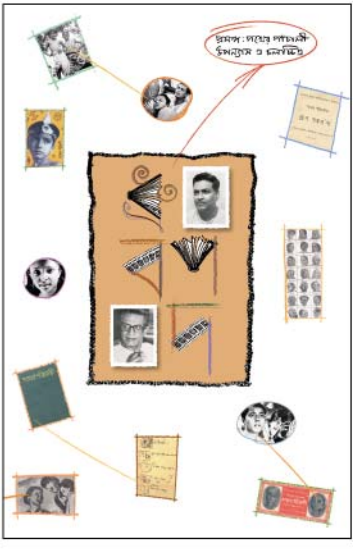

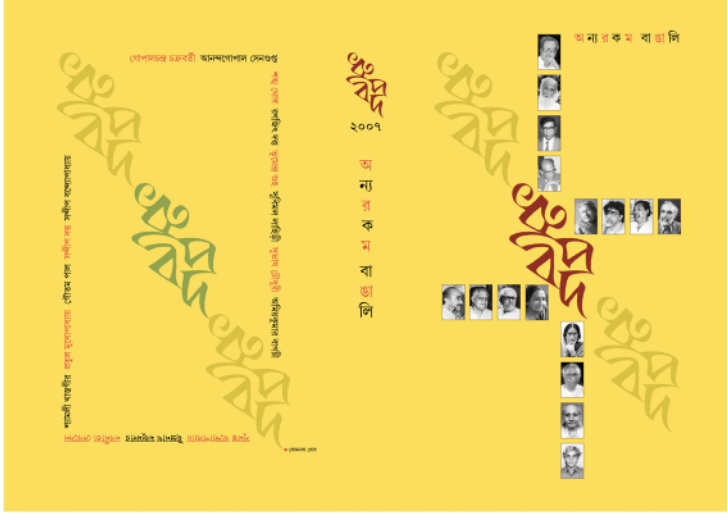

ভূমিকা ১

তরুণ সান্যাল
নদীসমুদ্রের কথা ([illegible]) ৫
সে (এখনো মেঘের নীচে) ৬

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়
[illegible] ([illegible]) ৭
[illegible] ([illegible]) ৭

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
তুমি চলে গেছ বলে ([illegible]) ৯
এই [illegible] ([illegible]) ১১

শীতল চৌধুরী
মুহূর্তের [illegible] ([illegible]) ১২
[illegible] ([illegible]) ১৩

সুকুমার ঘোষ
[illegible] ([illegible]) ১৪
[illegible] ([illegible]) ১৪

নির্মলেন্দু [illegible]
[illegible] ([illegible]) ১৭

[illegible] সরকার
[illegible] ([illegible]) ১৯

সুধীর চক্রবর্তী
[illegible] ([illegible]) ২০
[illegible] ([illegible]) ২০
একটি প্রেমের [illegible] ([illegible]) ২১

শিশির কুমার দাশ
[illegible] ([illegible]) ২৩
[illegible] ([illegible]) ২৩
[illegible] ([illegible]) ২৫

কবিপরিচিতি ২৭

অমৃত-যন্ত্রণা-র সূচিপত্র

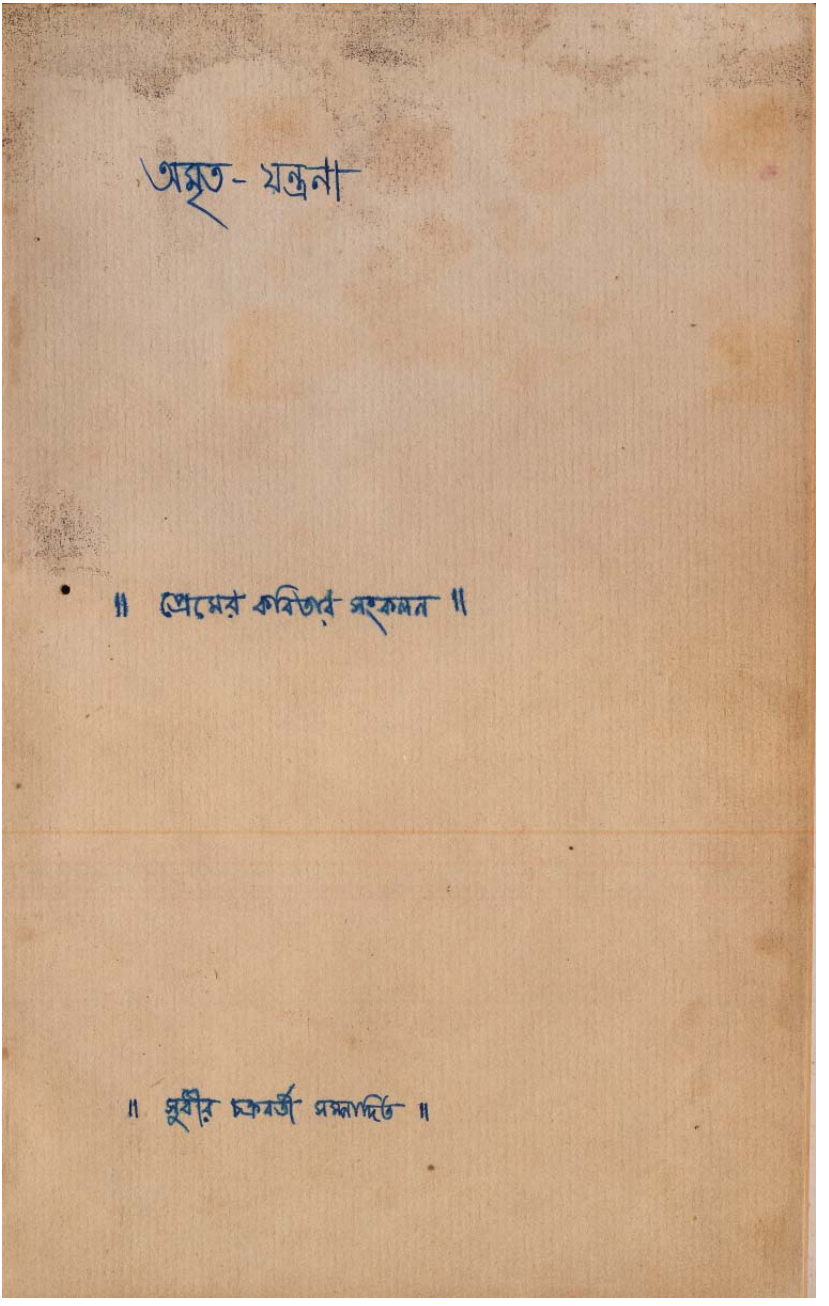

সুধীর চক্রবর্তীসম্পাদিত প্রথম বইয়ের টাইটেল পেজ

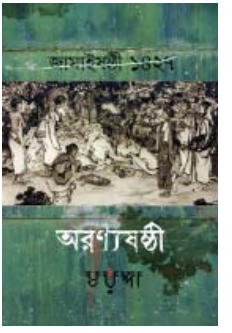

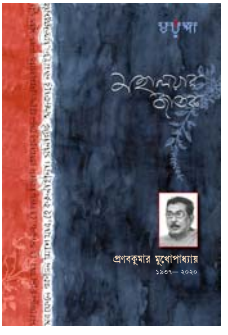

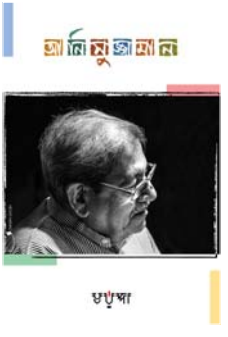

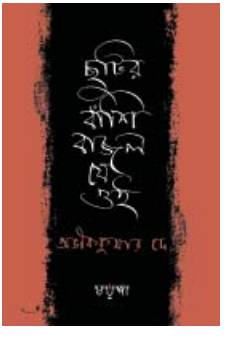

প্রকাশিত হয়েছে সংগ্রহ করুন

ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন

http://harappa.co.in/harappa_booklet.html